মনোজিৎ বসু

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ডাহুকিয়া ২৪-পরগণা হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক প্রকাশিত, ২৫, ডি এল রায় স্ট্রীট,
কলিকাতা কালিকা-প্রেস লিঃ হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত

আচার্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু

ছেলেবেলায় যাঁর লেখা 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী' প'ড়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি, বড় হ'য়ে যাঁর আঁকা 'শেষ-বোঝা', 'মৃত্যুশয্যায় শাজাহান', 'আলমগীর' প্রভৃতি ছবি দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছি, ভারতের সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী, আচার্য অবনীন্দ্রনাথের জীবনী লেখবার সৌভাগ্য একদিন হবে এ-কথা কোনোদিন ভাবিনি।

১৩৪৯ সালের কথা। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাই আমি, কাছে ব'সে গল্প শুনি। তিনি ব'লে চলেন তাঁর ছেলেবেলাকার কাহিনী, ঠাকুরবাড়ির গান-বাজনা অভিনয়ের কথা, শিল্পী-জীবনের বহু-বিচিত্র ঘটনা। তাঁর সস্নেহ সম্ভাষণ, মধুর আলাপ আমাকে বিশেষভাবে আনন্দ দেয়, আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণে ছুটে যাই বরা'নগরের 'গুপ্ত-নিবাসে,' কখনো সকালে, কখনো বিকালে, কখনো বা দুপুরে। নিরাশ হ'য়ে ফিরিনি কোনোদিন, স্মৃতির-ঝুলিতে ভ'রে এনেছি তাঁর সুমধুর কথা ও কাহিনী।

১৩৪৯ সালের ২৮শে ভাদ্র সোমবারের 'আনন্দমেলা-অবনীন্দ্রসংখ্যা'য়, 'অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা' নামে তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার দিন কয়েক পরে একদিন অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি কথাপ্রসঙ্গে ছোটদের উপযোগী ক'রে শিল্পগুরুর একখানি জীবনী লিখতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় সে-ভার আমাকে-ই নিতে বলেন, সেই সঙ্গে আমাকে সাহায্য করবেন ব'লেও প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই এই কাজে আমি অগ্রসর হই।

বহুকাল আগে 'চিত্রা' নামক কিশোর-মাসিকপত্রে অবনীন্দ্রনাথ ধারাবাহিক ভাবে তাঁর বাল্যস্মৃতি' প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় সেই প্রবন্ধাবলী আমাকে দেখতে দেন, সেই সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে বহু তথ্যের সন্ধান তাঁর কাছ থেকে পাই। এজন্যে মোহনলালবাবুর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর সাহায্য ও উৎসাহ না পেলে হয়তো এ-বই প্রকাশিত হ'তো না।

শিল্পগুরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে যে-সব গল্প, কথা ও কাহিনী শোনবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, সে-গুলিকে প্রবন্ধাকারে 'আনন্দমেলা'য় ও কয়েকটি কিশোর-মাসিকপত্রে প্রকাশ করেছিলাম। 'কৈশোরক'-এর সহকারী সম্পাদক বন্ধু শ্রীসুধাংশু গুপ্তের আগ্রহে 'অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘণ্টাকয়েক' এই নামে একটি প্রকাশিত হয় 'কৈশোরকে', আর 'আলাপী অবনীন্দ্রনাথ' ছাপা হয় 'পাঠশালা'য়।

সেই সব প্রবন্ধ, অবনীন্দ্রনাথের 'বাল্যস্মৃতি', আর বিভিন্ন সমালোচক ও শিল্পীর রচনা থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আমার এই বই আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেল। এই প্রসঙ্গে সুলেখিকা শ্রীযুক্তা রাণী চন্দের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করছি। তাঁর কাছেও আমি অশেষ ঋণী। তাঁর 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' থেকে আমি বহু সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাছাড়া 'আনন্দমেলা'য় প্রকাশিত তাঁর 'অবনীন্দ্রনাথের ছেলেখেলা' প্রবন্ধও আমাকে কিছু উপকরণ জুগিয়েছে। এই অবসরে শ্রীযুক্তা চন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আর একজন বন্ধুর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন বাংলার শিশু ও কিশোরের অকপট বন্ধু 'মৌমাছি'—শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার মূলে রয়েছেন তিনি এবং এ-বই প্রকাশের সময়েও তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার উপায় নেই। তা'তে বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। আমার এই রচনায় আমি ছোটদের উপযোগী ক'রে শিল্পগুরু—ও কিশোরসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জাদুকর—অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেছি। যাঁরা তাঁর শিল্প ও সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা দেখবার প্রয়াসী, এতে ক'রে তাঁরা হয়তো নিরাশ হবেন। কিন্তু ভরসা রাখি শিল্পগুরুর ঘনিষ্ঠতম শিষ্য ও আত্মীয়ের দ্বারা সে অভাব একদিন পূর্ণ হবে।

এই বইয়ের পরিসমাপ্তিতে যে কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে সেটি রচনা করেছেন পূজনীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল বসু। প্রচ্ছদপটটি এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শিষ্য শিল্পীবন্ধু শ্রীযুক্ত আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আর্ট-পেপারে-মুদ্রিত অবনীন্দ্রনাথের সুন্দর ছবিখানি পেয়েছি 'ভারত-ফটো-টাইপ-স্টুডিয়ো'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্তের সৌজন্যে।

কলিকাতা

মহালয়া, ১৩৫২

লেখক
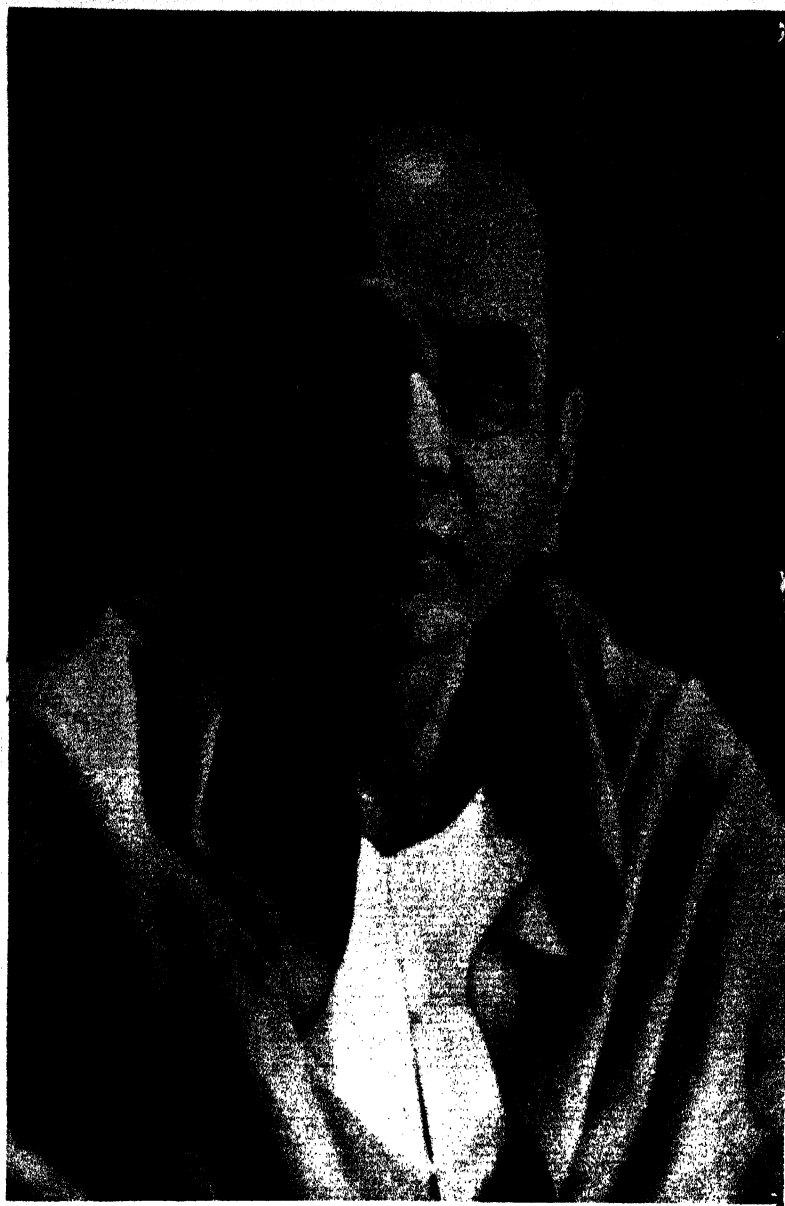
অবনীন্দ্রনাথ

ছেলেবেলা

১২৭৮ সালের ২৩-এ শ্রাবণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেদিন জন্মাষ্টমী উৎসব। সে দিনটি বাঙালীর পক্ষে সত্যিই এক পরম শুভদিন। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-বাড়িতে সেদিন যাঁর আবির্ভাব হ'লো, বাঙালীর তিনি গৌরব, ভারতের তিনি বিস্ময়। তিনিই আমাদের অবন ঠাকুর,—শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ।

প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মেজছেলে গিরীন্দ্রনাথ। গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ। তাঁরই কনিষ্ঠ সন্তান অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের বড় দু'ভাই—গগনেন্দ্রনাথ আর সমরেন্দ্রনাথ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন সহোদর ভাই। তাই, সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ হলেন অবনীন্দ্রনাথের 'রবিকা'।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এই দু'টি ছেলের মত ছেলে পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। এঁরা হ'লেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, আমাদের কালে আমরা এই জেনে গেলাম। এর পরে কি, তা ভাববার আর অবকাশই মেলে না। তার প্রয়োজনও দেখি না। এঁরা যা দিয়েছেন, এঁরা যা রেখে গেলেন, তার তুলনা কোথায়। সে-যে আকাশের মত বিরাট, সাগরের মত অতল।

ছেলেবেলায় অবনীন্দ্রনাথের ডাকনাম ছিল—অবন। ছোটপিসিমা আদর ক'রে ডাকতেন—অবা। তাই ব'লে ভেবো না 'অবা' নেহাৎ হাবাগোবা ধরনের শান্তশিষ্ট ছেলে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের মধ্যে তিনিই যেন একটা ব্যতিক্রম। সে-কথা পরে বলছি।

এই ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা মা-কাকীমার কাছে মানুষ হ'ত না সে-কথা নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ। তাই না? অবন ঠাকুরের ছেলেবেলা কেটেছে 'পদ্মদাসী'র কোলে, 'রামলাল' চাকরের কাছে। ঠাকুরবাড়ির প্রথা মতো প্রত্যেক ছেলের জন্যে থাকত এক দাসী। তার কাছে ছেলে দুধ খেত, খেলা করত, ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। তারপর ছেলে যেদিন 'সেয়ানা' হবার ছাড়পত্র পেত দাসীর কাছ থেকে, সেদিন চাকর এসে ছেলের চার্জ বুঝে নিত। অন্দরমহল ছেড়ে ছেলে সেদিন বাইরের মহলে এসে বাসা বাঁধত।

পদ্মদাসীর কোলেই অবন ঠাকুর শৈশবে মানুষ হয়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলছিলেন—"গল্প বলতে গেলেই মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা।...আমরা তখন খুব ছোটো। দাসীদের জিম্মেয় রেখে দেওয়া হ'তো আমাদের। তারাই আমাদের খাওয়াতো, পরাতো, স্নান করাতো।...পদ্মদাসী ছিল আমার চার্জে। রাত্তিরে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে, নয়তো গল্প ব'লে আমায় সে ঘুম পাড়াতো। যে-সে গল্প নয়, একেবারে ভূত-প্রেত দত্যি-দানার গল্প! 'এই মুলোর মত দাঁত, ইয়া বড় বড় কান, আগুনের ভাঁটার মত চোখ। এই এক ছাদে পা, আর ঐ আরেক ছাদে পা। ঐ তারা আসছে, শীগগির ঘুমিয়ে পড়ো'।—গল্প শোনার লোভে যদি বা জেগে থাকতুম, তা ওরা ভয় দেখিয়েই ঘুম পাড়িয়ে দিতো।...কিন্তু আমি জেগে আছি টের পেলে পদ্মদাসী কী করতো জানো? মশারি তুলে একটুখানি নারকোলের নাড়ু আমার মুখে গুঁজে দিতো। নাড়ু চুষতে চুষতে কখন ঘুমিয়ে পড়তুম তার ঠিক নেই। এক ঘুমে রাত কাবার।"

এই দাসীদের তিনি মাঝে মাঝে কি-রকম অপ্রস্তুত করতেন তার একটা গল্প বলছি শোনো। বরানগরের 'গুপ্তনিবাসে' আমাদের এক ঘরোয়া-বৈঠকে তিনি বলছিলেন—"দারুণ শীত তখন কলকাতায়। জানলার শার্সি বন্ধ করা হয়েছে। তবু শীত কমে না দেখে জানলার ওপরে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'লো তুলোর পর্দা। তবু কি শীত যায়! বড়ো একটা লেপের তলায় আমরা সবাই ঘুমুতুম।

শালুর লেপ, তার ওপরে মোড়া থাকতো পাতলা ওয়াড়। একদিন হয়েছে কি জানো, ভোরবেলায় পদ্মদাসী তো আবার লেপের তলায় খুঁজেই পায় না। 'ছেলে কোথা গো, ছেলে কোথা গো' ব'লে সে তো সোরগোল বাধিয়ে তুললো। শেষটা বিছানা তুলতে গিয়ে দেখে, আমি ওয়াড়ের মধ্যে ঢুকে বেশ কুণ্ডলী পাকিয়ে তুলো মেখে ঘুমুচ্ছি।"—দেখ ছেলের কাণ্ড।

পদ্মদাসী চ'লে যাবার পর এলো রামলাল। এই রামলালের হাতেই তাঁর সব ভার। রামলালই তাঁকে কাপড় জামা পরায়, নাওয়ায় খাওয়ায়, মায় ইংরেজি শেখায় পর্যন্ত। রামলালের প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—"ছোটোকর্তা ছিলেন রামলালের সামনে মস্ত আদর্শ, কাজেই একালের মতো না ক'রে অনেকটা সেকেলে ছাঁচে ফেললো সে আমাকে—দ্বিতীয় এক ছোটোকর্তা ক'রে তোলবার মতলবে। ছোটোকর্তা ছুরি-কাঁটাতে খেতেন, কাজেই আমাকেও রামলাল মাছের কাঁটাতে ভাতের মণ্ড গেঁথে খাইয়ে সাহেবি দস্তুরে পাকা করতে চললো; জাহাজে ক'রে বিলেত যাওয়া দরকার হ'তেও পারে, সেজন্যে সাধ্যমত রামলাল ইংরিজির তালিম দিতে লাগলো,—ইয়েস, নো, বেরি ওয়েল, টেক্ না টেক্—ইত্যাদি নানা মজার কথা।"

এই চাকরদের কাছেই বাড়ির ছেলেদের অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু তাই ব'লে দুষ্টুমি করলে এরা ছেড়ে দিত ভেবো না। এরাই করত ভাবী কর্তাদের শাসন। বাড়ির দেউড়িতে পাহারা দিত বুড়ো মনোহর সিং দরোয়ান। তার ছিল বেশ সাদা লম্বা দাড়ি। অবনীন্দ্রনাথের একদিন কি খেয়াল হ'লো বুড়োর দাড়িটা কেমন একবার হাত দিয়ে পরখ করতে হবে। মনে হ'তেই ছুটে গিয়ে মনোহরের দাড়ি ধরলেন চেপে। বুড়ো তো রেগে আগুন। একটা হুমকি দিতেই অবন ঠাকুর ছুটে পালালেন একেবারে দোতলায়। ভয়ে আর সেখান থেকে নামেন না। ব্যাপার শুনে রামলাল এলো কাছে। গম্ভীর স্বরে বললে,—"দাড়িতে হাত দিয়েছ তুমি, ভারি দোষ করেছ। যাও, হাত জোড় ক'রে দরোয়ানজির কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো।" চাকরদের শাসন ছিল এমনি কড়া।

কিন্তু সমস্ত শাসনের গণ্ডী এড়িয়ে চলত অবনীন্দ্রনাথের দুষ্টুমি। কখনো ধরা প'ড়ে মার খেতেন, কখনো ফাঁকতালে যেতেন বেঁচে। বিলিয়ার্ড টেবিলের নিচে, সিঁড়ির পাশে, ছুতোরের হাতুড়ি বাটালি নিয়ে, কারো আফিমের কৌটো চুরি ক'রে চলত তাঁর দুষ্টুমি। সে দুষ্টুমির লেখাজোখা নেই।

তাই পড়াশুনোর দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না। স্বেচ্ছায় কোনদিনই তিনি ইস্কুলে যেতে চাইতেন না। ধরে বেঁধে পাল্‌কির দরজা বন্ধ ক'রে তাঁকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লো—"ছেলেবেলায় আপনি নাকি পড়াশুনো মোটেই করতে চাইতেন না?"

—"রামোচন্দ্র। পড়াশুনো? ও-কথা তুলো না আর। পড়াশুনোয় মন ছিল না। পড়তুম তখন নর্মাল ইস্কুলে। লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত ব'লে আমাদের এক মাষ্টার ছিলেন। কী ভীষণ তাঁর চেহারা। দেখনি তো সে চেহারা, আর, পড়নি তো তেমন পণ্ডিতের পাল্লায়—লেখাপড়া ঘুরে যেতো। ঠিক যেন মা-দুর্গার অসুর। কালো, মোটা, আর চোখদুটো টকটকে লাল। দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যেতো। পড়াশুনো করবো কেমন ক'রে?"

—"মারতেন বুঝি খুব?"

—"উঃ সে কী মার! সব সময়ই একটা বেত থাকতো তাঁর হাতে।"

—"আপনি কোনদিন বেত খেয়েছিলেন ইস্কুলে?"

অবনীন্দ্রনাথ হেসে জবাব দেন—"খাইনি আবার! বেত মেরেছিলেন আমাদের মাষ্টার-মশায়। ইংরিজি পড়াতেন তিনি। একদিন তো 'পুডিং'-এর উচ্চারণ নিয়ে মহা তর্ক। মাষ্টার-মশায় বল্লেন—'পাডিং'। আমি বল্লুম, ওটা পাডিং নয়, পুডিং। বল্লুম—'রোজ বাড়িতে পুডিং খাই, আমি জানি না!' মাষ্টার-মশায় ধমকে বল্লেন—'বল্, পাডিং।' আমি বলি—'না, ওটা পুডিং।' তবু তিনি শুনবেন না, আর আমিও পাডিং বলব না। আমার কাণ্ড দেখে ক্লাসের ছেলেরা তো অবাক। মাষ্টার-মশায় রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন—'ছুটির পর একঘণ্টা কনফাইন।' ছুটি হয়ে গেলো। ছেলেরা যে যার মতো চ'লে গেলো বাড়িতে। আমি আরো একঘণ্টার জন্যে ইস্কুলের জেলখানায় বন্দী। বাইরে রামলাল গাড়ি নিয়ে উস্‌খুস্ করছে। মাষ্টার-মশায় কিছুক্ষণ বাদে আবার এলেন। বল্লেন—'এবারে বল, পাডিং।' আমার তখন জেদ চেপে গিয়েছে। বল্লুম—'পুডিং'। মাষ্টার তো রেগে টঙ্। টানাপাখার দড়িতে আমার হাত দুটো বেঁধে সপাসপ বেত লাগালেন পিঠে। পিঠ লাল হ'য়ে গেলো, তবুও পুডিং আর পাডিং হ'লো না।

"বাড়ি ফিরতে সেদিন দেরি হয়ে গেলো। ছোটপিসিমা জিজ্ঞেস করলেন—'কি ব্যাপার? এত দেরি যে!' রামলাল বল্লে—'বাবুকে কন্‌ফান্ রেখেছিল'।

কনফাইন। সবাই তো অবাক। বল্লেন—'কি করেছিস্? কি হয়েছে?' সব খুলে বল্লুম। বাবামশায় সব শুনে ইস্কুলে যেতে বারণ ক'রে দিলেন। এক পুডিং-এর কল্যাণেই ইস্কুল থেকে নাম কাটা গেলো।"

—"আর বুঝি ইস্কুলে গেলেন না?"

—"আবার! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু বাড়িতে পড়াশোনার ব্যবস্থা হ'লো। বাবামশায়ও মাঝে মাঝে আমাদের পড়াতেন। পরীক্ষাও নিতেন। ইস্কুলে প্রাইজ না পেলেও, একবার দাদাদের হারিয়ে দিয়ে বাংলার ইতিহাসে বাবামশায়ের কাছ থেকে ফার্স্ট-প্রাইজ পেয়েছিলুম। ভারি আনন্দ হয়েছিল সেদিন। বাংলার ইতিহাস কিন্তু বই প'ড়ে শিখিনি, বাবামশায়ের মুখে শুনে শুনে শিখেছিলুম।"

ইস্কুলের বদ্ধ ঘরের ভিতর কিশোর অবনীন্দ্রের প্রাণ হাঁফিয়ে উঠত। ইস্কুল তাঁর ভালো লাগত না মোটেই। ভালো লাগত ইস্কুলের বাইরের জগৎটা। ভালো লাগত ইস্কুল-বাড়ির পাশের বাড়ি। সে বাড়িতে থাকত একটা কালো ভালুক। সামনের বাগানটায় সে চ'লে বেড়াত। অবনীন্দ্র তাই দেখতেন ইস্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দেখতেন কেমন ক'রে ভালুকটা দাঁড়ায়, কেমন ক'রে শুয়ে প'ড়ে কাঁপতে থাকে হু হু ক'রে, কেমন হেলে দুলে সে চ'লে বেড়ায়।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বললেন—"ইস্কুলের কাছেই ছিল কাবুলী ফলওয়ালারা আর এক চীনেবাদামওয়ালা। বেশ মনে আছে তাদের কথা। টিফিনের সময় ওদের সঙ্গে দেখা হ'তো। একদিন হয়েছে কি জানো, ইস্কুলের বড়ো বড়ো ছেলেদের সঙ্গে কী নিয়ে এক কাবুলী ফলওয়ালার হয়েছে ঝগড়া। কে নাকি তাকে 'বেইমান' ব'লে গাল দিয়েছে। অমনি সব ক'টা কাবুলী উঠলো রুখে। একটা হৈ-চৈ গণ্ডগোল বেধে গেলো। ইস্কুলের দরোয়ান ব্যাটা গতিক ভালো নয় বুঝে তাড়াতাড়ি ইস্কুলের গেটটা দিলে বন্ধ ক'রে। সে এক মজা। কাবুলীগুলো বাইরে, আর ভেতরে আমরা। ঝগড়াটা বড়োদের হ'লেও, তাতে আনন্দ আছে দেখে' ছোটোরাও সব গিয়ে ভিড়েছি বড়োদের দলে। আর, বড়োদের সঙ্গে আমরাও তখন কাবুলীদের 'বেউমান' ব'লে গাল দিচ্ছি। তখন সে কী আনন্দ আর কী উৎসাহ! যে কাবুলীটাকে প্রথমে গালাগাল দেওয়া হয়েছিল, সে রেগে গিয়ে কী করলে জানো? হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে 'বেদানা' তুলে নিয়েই আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

তার ফলে, ওর বিশেষ লাভ হ'লো না, 'ফল'-লাভ হ'লো আমাদের। তাড়াতাড়ি আর কাড়াকাড়ি ক'রে বেদানাগুলো তুলে নিয়ে খেতে লাগলুম। এখন ভাবছি, কাবুলী ফল-ওয়ালার বদলে সে যদি কাবুলী সন্দেশ-ওয়ালা হ'তো!"

নর্মাল স্কুলের পর বাড়িতেই মাষ্টার রেখে অবনীন্দ্রনাথের পড়াশুনোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ন'-দশ বছর বয়সে তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। সেখানেই তাঁর লেখাপড়ার আসল চর্চা। নানা বিষয় নিয়ে তিনি সে-সময় কবিতা লিখতেন, একটু-আধটু ছবিও আঁকতেন। এর পর সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলেও তিনি কিছুদিন পড়াশুনো করেছিলেন। আসলে ভিতরে ছিল তাঁর কবি-মন আর শিল্পী-প্রাণ। সে মন, সে প্রাণ ধরাবাঁধা পাঠ্য-পুঁথির কড়াশাসনের বেড়াজালে ধরা দিতে চাইত না।

সত্যিকারের ইস্কুল ভালো না লাগলেও ছেলেবেলায় অবনের ভালো লাগত ইস্কুল-ইস্কুল খেলা। দু'বাড়ির মাঝখানে একটা ভাঙা বেঞ্চির ওপর বসত গুটি-কয়েক ছেলে। অবনও থাকতেন সেই ছেলের দলে। অবনের দীপুদা হতেন সেই খেলার ইস্কুলের জাঁদরেল মাষ্টার। কিন্তু দেউড়ির কাছে যেই আসত চীনেবাদাম লজেঞ্চুস ঘুগ্নিদানা নিয়ে ফেরিওয়ালার দল, তখন প'ড়ে থাকত ইস্কুল, কেউ ভয় পেত না মাষ্টারের ধমকানিতে—সবাই দিত ছুট। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যেত খেলার ইস্কুলের ছাত্র থেকে মাষ্টার-মশায় অবধি সবাই কোলের ওপর ঠোঙা রেখে চীনেবাদাম চিবোচ্ছেন!

ছেলেবেলায় ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমিটাই হ'লো তাদের আসল চেহারা, সত্যিকারের রূপ। তার ভিতর দিয়েই ফুটে ওঠে শৈশবের আনন্দ, কৈশোরের কৌতূহল। ঠাকুরবাড়ির কঠিন শৃঙ্খলা ও শাসনের ফাঁকে ফাঁকে কেমন ক'রে কিশোর অবনের দুষ্টুমি চল্‌ত, ভাবতে গেলে তা' আশ্চর্য-ই মনে হয়।

গল্প করতে করতে একদিন তিনি বলছিলেন—"আমার বয়স তখন খুব অল্প, সেই সময়কার কথা। বাবামশায়ের খুব পাখি পোষার শখ ছিল। নানারকমের পাখি তিনি পুষতেন। লালমোহন, নীলমোহন, নানা রং-বেরঙের পাখি। সেই সব পাখির খাঁচা তৈরি করবার জন্যে বাড়িতে আসতো চীনে-মিস্ত্রি। হাতুড়ি-বাটালি নিয়ে ঠুকঠুক ক'রে তারা কাজ করতো। ওদের কাজ দেখতুম ব'সে ব'সে। খাঁচা তৈরি হ'তো। সে তো খাঁচা নয়, যেন এক একটা প্যাগোডা। ভারি সুন্দর দেখতে।"

—"আপনারও বুঝি ইচ্ছে করতো ঐ রকম খাঁচা তৈরি করতে ?"

—"হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে। শখ যেতো ঐ রকম হাতুড়ি-বাটালি নিয়ে মিস্ত্রিগিরি শুরু করি। একদিন যেই-না দেখলুম মিস্ত্রিরা সব গেছে খেতে, অমনি চট ক'রে গিয়ে বস্‌লুম সেখানে। তারপর একটুকরো কাঠ আর হাতুড়ি-বাটালি নিয়ে লেগে গেলুম বিদ্যে ফলাতে। কিন্তু বিদ্যে থাকলে তো ? বাটালির খোঁচা লেগে বুড়ো-আঙুলের ডগাটাই গেলো কেটে। দরদর ক'রে রক্ত পড়তে লাগলো। ভয় পেয়ে ছুটে পালালুম। ওদিকে তো মিস্ত্রিরা এসে দেখে, তাদের জিনিসপত্তর সব ওলটপালট। বাটালিতে রক্তের দাগ। অমনি একটা সোরগোল প'ড়ে গেলো—কে এ কাজ করেছে। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। আমি তখন লুকিয়ে আঙুল চুষছি রক্ত থামাবার জন্যে।"

আরেকবার তিনি আরেক রকম দুষ্টুমি করতে গিয়ে সাজা পান বেশ। একদিন তাঁর শখ হ'লো গুড়গুড়িতে তামাক টানতে হবে। কিন্তু গুড়গুড়ি কোথায় ? কাছেই পেলেন একটা গাড়ু। তার ভিতর খানিকটা জল ভ'রে নিয়ে টান্‌তে লাগলেন ভুর্ ভুর্ ক'রে। এমন সময় পেছন থেকে কার যেন পায়ের শব্দ। চমকে উঠে যেই পালাতে যাবেন, অমনি শখের হুঁকোটার ওপর পড়লেন হুড়মুড় ক'রে। ফলে তাঁর ঠোঁট গেল কেটে। এই প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"সেবারে নীলমাধব ডাক্তার এলে তবে নিস্তার পাই—অনেক বরফ আর ধমকের পরে। দেখেছি, যখন দুষ্টুমির শাস্তি নিজের শরীরে কিছু না কিছু আপনা হ'তেই পড়েছে তখন গুরুজনদের কাছ থেকে উপরি আরো দু'চার ঘা বড়ো একটা আসতো না ; কিন্তু দুষ্টুমি ক'রে যখন অক্ষত শরীরে আছি তখনি বেত খেতে হ'তো, নয়তো ধমক, নয়তো অন্দরে কারাবাস। এই শেষের শাস্তিটাই আমার কাছে ছিল ভয়ের, কুইনিন খাওয়ার চেয়েও বিষময় লাগতো।" বাড়ির ভিতরে তাঁকে বন্দী থাকতে হবে, এ তিনি ভাবতে পারতেন না।

অবনীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে ভালোবাসতেন তাঁর ছোটপিসি। অন্দরে বন্দী হয়ে যে-ক'দিন তাঁকে থাকতে হ'ত, সে-ক'দিন ছোটপিসির ঘরে ছিল তাঁর নিশ্বাস ফেলবার জায়গা। ছোটপিসির কাছেই চল্‌ত তাঁর হাসি-কান্না, তাঁর সুখ-দুঃখের কথা। ছোটপিসির কাছেই ছিল তাঁর আদর ও আবদার। এই ছোটপিসির সঙ্গে কি তিনি কম দুষ্টুমি করেছেন ? দুষ্টুমির নমুনাটা শোনো একবার—তিনি বলছেন—

—"ছেলেবেলায় আমার ছোটো ছোটো কৌটোর ওপর ভারি লোভ ছিল। গোকুল চাটুজ্জে মশায় খুব আফিম খেতেন। তাঁর আফিমের কৌটো একবার চুরি করেছিলুম। আর-একদিন চুরি করেছিলুম ছোটপিসিমার আফিমের কৌটো। সে এক মজার কাণ্ড! হয়েছে কি জানো, কৌটোটা চুরি ক'রে আফিমের গুলীগুলো আলমারির পেছনে ফেলে দিয়ে সেই কৌটো নিয়ে স'রে পড়লুম। কৌটোটা ছিল ভারি সুন্দর, তাই লোভ ছিল ওটার ওপর। এদিকে তো খোঁজ প'ড়ে গেলো কে আফিম চুরি করেছে। শেষটা কৌটো-সুদ্ধ ধরা প'ড়ে গেলুম। ছোটপিসিমা তো ভয়ে অস্থির। ভেবেছিলেন আফিমের গুলী-ই বুঝি বা খেয়ে ফেলেছি! ব্যস্ত হয়ে তাই বার বার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করলি আফিমের গুলীগুলো? খাসনি তো? সত্যি ক'রে বল্।' পঞ্চাশবার হাঁ করান, জিভ্ দেখেন। শেষে আলমারির পেছনে গুনে দেখা গেলো, ঠিকই আছে, একটি বড়িও হারায়নি, তখন পিসিমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।"

দুষ্টুমির কি অন্ত আছে! কত রকম ফন্দি যে খেলত মাথায় তার ঠিক নেই। দোতলার বারান্দায় থাকত জলে-ভরতি বড় টব। তাতে খেলে বেড়াত লাল মাছ। একদিন দুপুরে কী খেয়াল হ'লো, কিশোর অবন ভাবলেন,—লাল মাছ, কাজেই তার জলটাও লাল হওয়া দরকার। না হ'লে মানায়?—যে কথা সেই কাজ। কোত্থেকে খানিকটা লাল রঙ এনে, দিলেন সেই জলে গুলে। জলটা লালে লাল হয়ে উঠল। অবন দেখেন আর ভাবেন—বাঃ এই তো বেশ, লাল জলে লাল মাছ! ওদিকে বিকেলে মহা হৈ-চৈ। গোটা দুই মাছ ম'রে ভেসে উঠেছে সেই লাল-রঙের দৌলতে। মালী চীৎকার ক'রে বাড়ি মাথায় করছে—কে এমন দুষ্টুমি করলে! অবন শুনতে পেয়ে দিলেন ভোঁ দৌড়—একেবারে সোজা পিসিমার ঘরে।

অবনীন্দ্রনাথের বাবা গুণেন্দ্রনাথও ছিলেন উঁচুদরের শিল্পী। পাখি পোষার ছিল তাঁর ভারি শখ। সে কথা তো আগেই বলেছি। খাঁচায় ভরা থাকত তাঁর আদরের ক্যানারির দল। সেই ক্যানারি দেখে একদিন দুষ্টু অবনের কি শখ হ'লো জানো? ভাবলেন, পাখিগুলোকে ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে ওরা কেমন ক'রে উড়ে যায়। কিন্তু খাঁচার দরজা খুলতে তাঁর নিজের সাহসে কুলালো না। টুনি ব'লে এক ফিরিঙ্গি ছোকরা প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে আসত শ্রীরামপুর থেকে। তারও ছিল পাখি পোষার শখ। সুযোগ বুঝে

পাখি চুরি করতেও সে ছাড়ত না। তাকেই একদিন ধ'রে বসলেন অবনীন্দ্রনাথ। বললেন—"দাওনা পাখির খাঁচা খুলে। বেশ উড়বে। জাল রয়েছে এখানে, আবার ধরা যাবে।"

টুনিসাহেব তো দিলেন খাঁচার দরজা খুলে। অমনি পাখিগুলো সব বাইরে বেরিয়ে এলো। ডানা মেলে উধাও হ'লো আকাশে। জাল ফেলে ধরবার অনেক চেষ্টা হ'লো; কিন্তু বনের পাখি পেয়েছে ছাড়া-পাওয়ার আনন্দ, আর কি তারা ফিরে আসে। ব্যাপার বুঝে টুনিসাহেব তো লম্বা দিলেন, ধরা পড়লেন অবন ঠাকুর।

ছেলেবেলায় এই রকম কত দুষ্টুমিই যে তাঁর মাথায় খেলত।

কথায় কথায় একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো—"ছেলেবেলায় কী করতে আপনার সবচাইতে ভালো লাগতো?"

সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন—"সবচেয়ে আমার ভালো লাগতো ভেতরে কী আছে তাই দেখতে। সব জিনিসেরই ভেতরে কী আছে তাই দেখবার চেষ্টা করতুম। কলের যে-সব খেলনা পেতুম, সব দেখতুম খুলে খুলে, ভেতরে কী আছে। কিন্তু খেলনাগুলো আর আস্ত থাকতো না, ভেঙে যেতো একদম। এখনো আমার খুব ভালো লাগে খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। এই দেখনা, আমার সঙ্গে এসেছে আমার পূর্বপুরুষদের কালের ঘড়িটা। প্রায় দু'শো বছরের পুরোনো। ওটার বয়েস হয়েছে তো, তাই মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়—এই যেমন আমিও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঘড়িটা আর-কেউ সারাতে পারে না। বুড়ো ঘড়িকে আমি বুড়োমানুষ খুলে-খেলে দিলে তবেই ও চালু হয়।"

এই 'ভিতর' দেখবার কৌতূহলে, ছেলেবেলায় অবনীন্দ্রনাথ একবার যা কাণ্ড করেছিলেন, সে ভারি মজার। শুনলে না হেসে থাকা যায় না।

তখন তিনি খুব ছোট। তাঁর এক জ্যাঠাইমা ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন তাঁর ঘরে। সেই জ্যাঠাইমারও ছিল পাখি পোষার ভারি শখ। লাল নীল কত পাখিই যে তিনি পুষতেন তার ঠিক নেই। আর ছিল এক বুড়ী দাসী। রামায়ণের মন্থরা-বুড়ীর মত। সে-ই পাখিদের চান করাত, খাওয়াত, পড়াত, দেখাশুনো করত।

এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলছিলেন—"দুপুরবেলায় আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে উঠছি জ্যাঠাইমার ঘরে। জ্যাঠাইমার ঘর তো ঘর নয়, যেন এক

রহস্যপুরী। উঠতে গিয়ে দেখি, তাকের ওপর সুন্দর সুন্দর পুতুল সাজানো। কোনোটা কেষ্টমূর্তি, দিব্যি নীল রঙের, হাতে বাঁশি; কোনোটা ধ্যানমগ্ন মহাদেব; কোনোটা হরপার্বতী। ভারি লোভ হ'লো, পেতুম যদি ওর একটা। আস্তে আস্তে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তখন ঘরে ঢুকতে কিজানি কেমন ভয় করতো। এখনকার ছেলেরা যেমন সোজা গিয়ে বলতে পারে—'জ্যাঠাইমা, আমি এসেছি', কি 'পিসিমা, শোনো'—তখন কিন্তু আমরা সে-রকম কইতে পারতুম না। তাই আস্তে আস্তে ডাকলুম—বড়মা। বড়মা!—বড়মা বল্লেন, 'কিরে, কী বলছিস্?' আবদারের সুরে বল্লুম—'আমাকে ঐ মাটির কেষ্টটি দেবে?' বড়মা দাসীকে দিয়ে সেই নীলকেষ্টর মূর্তিটা পাড়িয়ে আমায় দিলেন। বল্লেন, 'দেখিস্, ভাঙিস্‌নে যেন।'

"আমার তখন কী আনন্দ। আমি ভাবতেই পারিনি যে, অমন কেষ্টমূর্তিটা আমার হবে। আর, সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলুম এইজন্যে যে, দাদারা কেউ পেলে না, আমি পেলুম। মূর্তিটাকে নিয়ে নিচে নেমে এলুম। দাদাদের দেখিয়ে বল্লুম—'দেখ, তোমরা তো কেউ পেলে না, আমি কেমন পেয়ে গেলুম।' কিন্তু তারপর এক কাণ্ড ঘ'টে গেল। দাদাদের মধ্যে একজন এসে বল্লেন—'দেখ্, ঐ ওপরে উঠে ঠাকুরটাকে দে মাটিতে ফেলে, দেখবি ওর ভেতর থেকে ভারি একটা আশ্চর্য জিনিস বেরুবে—ঠাকুরের জ্যোতি।' আশ্চর্য জিনিস দেখবার আমার ভারি শখ। তাই তাঁর কথা মতো ওপর থেকে দিলুম ঠাকুরটাকে দুম্ ক'রে ফেলে। ব্যস্, ভেঙে একেবারে চুরমার। আশ্চর্য জিনিস আর বেরুল না। দাদারা হো হো ক'রে হেসে-উঠে চম্পট দিলে। আমি তো কেঁদেই আকুল।"

অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যে চেহারা ছিল, সে চেহারা আর নেই। কত কাল কেটে গিয়েছে, কত পরিবর্তন হয়েছে তার। ছেলেবেলায় অবন শুনতে পেতেন পেটা-ঘড়িতে বাজছে ঢং ঢং ঢং। ভোরের ঘড়ি বাজত ঘুম ভাঙাবার জন্যে, তারপর সাতটার ঘড়ি উপাসনার জন্যে, সাড়ে সাতটার ঘড়ি হ'লো পড়তে যাবার জন্যে, দশটার ঘড়ি স্নান-আহারের আর সাড়ে দশটার ঘড়ি হ'লো ইস্কুল-আপিসে যাবার নির্দেশ। চারটের ঘড়ি বাজলে বুঝতে হবে জলযোগের পালা, কাজকর্ম, কাছারি এবার

বন্ধ। এমনি ক'রে ঘড়ির হুকুমে চল্‌ত বাড়ির গাড়িঘোড়া, চাকরবাকর, ছেলেমেয়ে সবাই।

পেটা-ঘড়ির ঢং ঢং আওয়াজ কিশোর-অবনের ভারি ভালো লাগত। তাঁরও ইচ্ছে হ'ত হাতুড়িটা তুলে নিয়ে ঘড়িতে মারেন ঘা। কিন্তু হাতুড়িতে হাত দেওয়া মাত্র ধমকে উঠত সোভারাম জমাদার—"নেহি, কর্‌তা-মহারাজ খাপ্‌পা হোয়েঙ্গা।" ভয় পেয়ে অবন পিছিয়ে আসতেন। সব দিকে কেবলি বাধা, কেবলি হুকুম, কেবলি শাসন। হাঁপিয়ে উঠত কচি মন।

সোভারামের কর্‌তা-মহারাজ আর কেউ নন্—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র-নাথের কর্তাদাদামশায়। আজকালকার নাতি-নাতনীদের সঙ্গে ঠাকুর্দা, দাদামশায়ের কত ভাব। তখন কিন্তু বুড়োদের সঙ্গে মেশবার বা তাঁদের কাছে ঘেঁসবার সুযোগ পেত না ছেলেমেয়েরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। সব সময় বুড়োদের কাছ থেকে দূরে, বড়দেরও সঙ্গ এড়িয়ে ছেলেমেয়েদের চল্‌তে হ'ত।

মহর্ষি প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো বোলপুরে, কখনো সিমলায়, কখনো হিমালয়ে। বাড়িতে থাকলেও তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য অবনের হয়নি ছেলেবেলায়—কতকটা ভয়ে, কতকটা বাড়ির শাসনে। কিন্তু তাঁর ভারি ইচ্ছে করত কর্তাদাদামশায়কে দেখবার জন্যে।

একদিন সকালবেলায় অবন বাড়ির উত্তরের ফটকের রেলিঙ্‌গুলোতে পা রেখে দোল খাচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ মহর্ষির গাড়ি ফটকে এসে দাঁড়াল। মহর্ষি নামলেন গাড়ি থেকে। পরনে লম্বা চাপকান, জোব্বা, পাগ্‌ড়ি। অবন সাহস ক'রে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। মহর্ষি তাঁর মাথাটা একবার ছুঁয়ে উপরে উঠে গেলেন। অবনের তখন কী আনন্দ। তিনি কর্তাদাদামশায়ের দেখা পেয়েছেন! শুধু দূর থেকে দেখা নয়, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেছেন পর্যন্ত। খবরটা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে অন্দরমহলে, অবনের মায়ের কাছে। তিনি তো ময়লা কাপড়চোপড়ে মহর্ষির সামনে যাবার জন্যে তাঁকে বেশ ক'রে ধমকে দিলেন। এদিকে রামলাল এলো ছুটে। অবনকে ধ'রে নিয়ে ফরসা জামা-কাপড় পরিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

অবনীন্দ্রনাথের কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে নিতান্ত অনাড়ম্বর ভাবে। ঠাকুরবাড়ির সেকেলে-দস্তুরই ছিল তাই। ছেলেমেয়েরা বিলাসিতার নামগন্ধও জানত না কোনদিন। খুব সাদাসিধে ভাবেই মানুষ হয়েছে সবাই। খুব শীতের

সময়েও কেউ উলের-জামা, সোয়েটার এসব পরতে পেত না। একটা জামায় শীত না মানালে তার ওপর আর একটা শাদা জামা, তাতেও না কুলোলে বড়জোর একটা বনাতের ফতুয়া। ভাবতে পারবে একালের ছেলেমেয়েরা? বিলাসিতার স্রোতে ছেলেবেলার সেই দিনগুলি কেটে যায়নি ব'লেই, অবনীন্দ্রনাথ এত বড় হ'তে পেরেছেন।

শিল্পী

অবনীন্দ্রনাথের আসল পরিচয় হ'লো—তিনি শিল্পী। শুধু শিল্পী নয়, আধুনিক ভারতের শিল্প-গুরু। তাঁকে বলা হয় 'ফাদার অব ইণ্ডিয়ান আর্ট।' ভারতের প্রাচীন শিল্পের মধ্যে-যে এক অপূর্ব সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এ-কথা আমরা যেদিন প্রায় ভুলতে বসেছিলাম, বিলিতি চিত্রকলায় যেদিন আমাদের চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, সেইদিনই নতুন বিস্ময় নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তিনিই আবার ভুলে-যাওয়া ভারতীয়-শিল্পের প্রবর্তন করলেন।

শিল্পী-জীবনের শুরুতে কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, বহু প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছে তাঁর সেই নতুন চিত্রকলার। তাঁর আঁকা ছবি যেদিন কাগজে কাগজে বের হ'তে লাগল, সবাই যখন তাঁর ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কতকটা বিস্ময়ে স্তম্ভিত, সেই সময়-ই আবার একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তাঁরা বললেন—'ও আবার ছবি! না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু! সরু সরু লম্বা হাত, লতার মত আঙুল, লম্বা লম্বা চোখ—ওই কিনা ভালোছবি!' তাঁদের মতে ছবির নরনারী হবে দুধ-ঘি-খাওয়া মোটাসোটা গোলগাল চেহারার। এইরকম ক'রে নানাভাবে সেদিন একদল লোক অবনীন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে বিদ্রূপ করতে শুরু করলেন।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ বিরুদ্ধপক্ষের কোনো সমালোচনা সেদিন গ্রাহ্য করেননি। নিজের ধ্যানে তিনি তখন তন্ময়, আত্মহারা। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্য তিনি খুঁজে পেলেন, তুলির রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুললেন সেই অনির্বচনীয় রূপ। ক্রমে ক্রমে তাঁর অনুরাগী শিল্পীর

সংখ্যাও বাড়তে থাকল। বাঙলাদেশের সীমা অতিক্রম ক'রে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে, দেশে-বিদেশে, সাগরপারের সকল রাজ্যে। তারপর এলো পুরস্কার, এলো উপঢৌকন, এলো রাজার সম্মান। অবনীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সভায় আসন পেলেন।

একদিন তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লো—"আচ্ছা, ছবি আঁকবার খেয়ালটা কী ভাবে আপনার মাথায় এলো?"

তিনি বললেন—"কী ভাবে যে মাথায় এলো জানি না। তবে ছেলেবেলা থেকেই খুব ছবি দেখতুম। ঐ দেখে-দেখেই একদিন আঁকতে শুরু করি। ছোট-পিসেমশাই একবার আমায় একখানা হাঁসের ছবি দিয়েছিলেন, সেখানাই প্রথম কপি করি। তিনিই আমাকে আঁকতে উৎসাহ দিতেন বেশি। একবার একখানা জাপানী ঘসা কাচের ট্রেসিং শ্লেটও তিনি আমায় কিনে দিয়েছিলেন। এখন আর সে শ্লেট পাওয়া যায় না, পেলেও তার অনেক দাম।"

—"রঙ পেতেন কোথায়?"

—"রঙের জন্যে আবার ভাবনা। বাবামশায়ের টেবিলের ওপর প'ড়ে থাকতো লাল-নীল পেন্সিল। সেই পেন্সিল দিয়ে, নয়তো হলুদ গুলে' চলতো আমার ছবি রঙ করা। ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই একটু আধটু ছবি আঁকতে ও রঙ করতে শুরু করি। সংস্কৃত কলেজে আমার এক বন্ধু ছিল। তার নাম ছিল অনুকূল। সে আমাকে লক্ষ্মী সরস্বতী আঁকতে শিখিয়েছিল। বলতে গেলে সে-ই ছিল আমার ছবি-আঁকা শেখার প্রথম মাষ্টার।"

আসলে সেকালের ঠাকুরবাড়ি ছিল সকল রকম শিল্পকলার সাধনাপীঠ। ছবি আঁকা, গান-বাজনার চর্চা, সাহিত্যের সাধনা—সব কিছুই চলত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।

অবনীন্দ্রনাথের বাবা গুণেন্দ্রনাথেরও ছবি আঁকার শখ ছিল। অনেক ভালো ভালো ছবি এঁকেছেন তিনি। অবনের বড়দাদা গগনেন্দ্রনাথ সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ছবি আঁকা শিখতেন। পরে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে সম্মান পেয়ে গেছেন। কাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছবি আঁকতেন, বিশেষ ক'রে 'পোরট্রেট' আঁকতেন তিনি। মেজদাদা সমরেন্দ্রনাথের আবার ঝোঁক ছিল হাতির দাঁতের ওপর কারুকাজ করবার। এক কথায়, অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীদের সঙ্গ ও আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ হয়েছেন।

তাছাড়া ছেলেবেলায় অবনীন্দ্রের দৃষ্টিও ছিল সব দিকে। যেখানে যত ছবি আছে সব তিনি দেখে বেড়াতেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। তাঁর ছোট-পিসিমার ঘরে কত রকমের দেবদেবীর পট, অয়েলপেন্টিং ঝোলানো থাকত। সেই 'শ্রীকৃষ্ণের পায়েস ভক্ষণ', 'শকুন্তলা', 'মদনভস্ম', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি ছবিগুলো ছিল তাঁর কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু। কিশোর অবন অবাক হ'য়ে দেখতেন সব।

অবনীন্দ্রনাথ যখন ন'-দশ বছরের তখন একবার তাঁদের পরিবার কলকাতা থেকে মাইল পনেরো দূরে গঙ্গাতীরের এক বাগানবাড়িতে গিয়ে বাস করেন। চমৎকার সেই বাগানবাড়ি। সারি সারি ফুল ও ফলের গাছ। হরিণ, ময়ূর, বক, কত রকমের জীবজন্তু চ'রে বেড়াত সেখানে। তাছাড়া নানারকম কারুকার্য-খচিত আসবাবপত্রে সাজানো থাকত বাড়ির ঘরগুলি। এই সমস্তই কিশোর শিল্পীর মনে জাগাত অনুপ্রেরণা। কাগজ কলম, তুলি, পেন্সিল নিয়ে তিনি ব'সে যেতেন, আর আপন মনে এঁকে যেতেন পশু, পাখি, প্রকৃতির ছবি। কলসি কাঁখে গাঁয়ের মেয়েরা যাচ্ছে নদীর ঘাটে, রাখাল গোরু নিয়ে ফিরছে ঘরে, নৌকো যাচ্ছে পাল তুলে নদীর ওপর দিয়ে—এই-সব তিনি ব'সে ব'সে দেখতেন, আর এঁকে যেতেন শাদা কাগজের পাতায় পাতায়।

এই রকম ক'রে নিজে নিজেই তিনি ছবি আঁকা শিখলেন। তারপর যখন তাঁর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, সেই সময় গভর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলে গেলেন চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী হবার বাসনা নিয়ে। আর্ট স্কুলের ভাইস্-প্রিন্সিপাল তখন ইটালিয়ান শিল্পী গিলার্ডি সাহেব। তাঁর কাছে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ছবি আঁকা শেখবার বন্দোবস্ত হ'লো। তাঁরই কাছে অবনীন্দ্রনাথ লাইন্-ড্রইং শেখেন। তিনি খুব যত্ন নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে ছবি আঁকা শেখাতেন। প্যাস্‌টেলের কাজ, প্রতিকৃতি আঁকা, তেলরঙের ছবি আঁকাও তিনি শিখিয়েছিলেন অবনীন্দ্রকে। কিন্তু সবকিছুই বিদেশী পদ্ধতিতে।

রবি বর্মা তখন বিখ্যাত আর্টিস্‌ট্। দেশজোড়া তাঁর নাম। তিনি একদিন ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের স্‌টুডিয়ো দেখে মুগ্ধ হন। প্রশংসা ক'রে সেদিন ঠাকুরবাড়ির সবাইকে তিনি ব'লে এসেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। রবি বর্মার সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফ'লে গেল কয়েক বছরের মধ্যেই।

গিলার্ডি সাহেবের কাছে অবনীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকা শিখছেন, সেই

সময় ইংলণ্ড থেকে বিখ্যাত আর্টিস্ট সি, এল, পামার এলেন কলকাতায়। এই পামার সাহেবের কাছে অবনীন্দ্রনাথ জল-রঙের কাজ শেখেন। তারপর অয়েল-পেন্টিং-এও পারদর্শী হয়ে ওঠেন পামার সাহেবের কাছে থাকতেই। দু'ঘণ্টার মধ্যেই সে-সময় তিনি নাকি আবক্ষ প্রতিকৃতি আঁকতে পারতেন।

এই পামার সাহেব একদিন অবনীন্দ্রকে বললেন যে, তাঁর যা শেখাবার, তিনি তা শিখিয়ে দিয়েছেন, এইবার মানুষের এ্যানাটমি অর্থাৎ শরীরের খুঁটিনাটি সবকিছু তাঁর শিখতে হবে ভালো ক'রে। এই ব'লে আঁকবার জন্যে তাঁকে এনে দিলেন একটা মড়ার মাথা। সেই মড়ার মাথা দেখে শিল্পী অবনের তো চক্ষু চড়কগাছ। গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল তাঁর। সাহেবকে বললেন, তাঁর মাথাটা কেমন করছে। সাহেব বললেন, যাই করুক, ওটা তাঁকে আঁকতেই হবে। মাষ্টারের আদেশ। অগত্যা সেটা এঁকে দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু বাড়িতে ফিরে দেখেন তাঁর শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে, ১০৬ ডিগ্রি জ্বর। তারপর কিছুকাল আর তিনি পামার সাহেবের কাছে ছবি আঁকতে যান নি।

কিছুদিন পরে আবার তাঁর শখ হ'লো, ভালো ক'রে জলরঙের কাজ শিখতে হবে। পামার সাহেবের কাছে তাই আবার গেলেন—রঙ, তুলি, কাগজ, পেন্সিল হাতে ক'রে। প্রকৃতির ছবি আঁকতে শিখলেন সুদক্ষ শিল্পীর মত। সাহেব-মাষ্টার অবাক হ'য়ে গেলেন তাঁর আঁকা ছবি দেখে। এই সময় পামার সাহেবের কাছে শিক্ষা শেষ ক'রে অবনীন্দ্র গেলেন মুঙ্গেরে বেড়াতে। মুঙ্গেরের নদীতীরে ব'সে প্রাণভ'রে প্রকৃতির দৃশ্যপট তুলতে লাগলেন তাঁর তুলির রেখায়। পশ্চিমভারতের গ্রামবাসীদের চালচলন, রীতিপদ্ধতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-অনুষ্ঠান তিনি দেখতে লাগলেন, আর রূপ দিতে লাগলেন তাঁর চিত্রপটে।

অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় শিল্পেরই অঙ্কন-পদ্ধতি শিখেছিলেন বিশেষ ক'রে। কিন্তু তাতে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। খালি মনে হ'ত—কিছু হ'লো না, কিছু আঁকতে পারলুম না। এই সময় একদিন হঠাৎ তিনি একখানা প্রাচীন পুঁথি পেয়ে গেলেন তাঁর প্রপিতামহ প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গ্রন্থশালায়।

মোগলযুগের প্রাচীন-চিত্রের পুঁথি সেখানা।

কত সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা সেই পুঁথির প্রতিটি চিত্রপট। অবনীন্দ্রনাথ দেখেন, আর বিস্ময়ে পুলকে মুগ্ধ হয়ে যান। চোখের সামনে তিনি দেখতে পেলেন নতুন শিল্পজগৎ। ইউরোপীয়-শিল্পের ছাত্রের চোখে সেদিন ধরা দিল

ভারতীয়-শিল্পের রূপ-মাধুর্য। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ মনের খোরাক খুঁজে পেলেন এতকাল পরে। আবার তিনি নতুন ক'রে ছবি আঁকতে শুরু করলেন।

এই সময়েই আবার তাঁর ভগ্নীপতি শেষেন্দু দিল্লির একখানা পার্শিয়ান ছবির-বই তাঁকে উপহার দিলেন। দিল্লির ইন্দ্রসভার অপরূপ নক্সা দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

তার ওপর, অবনীন্দ্রনাথের ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক মেমসাহেব-বন্ধু মিসেস্ মার্টিনডেল তাঁকে একখানা কবিতার-বই ইলিউমিনেট ক'রে পাঠিয়ে দেন। ইলিউমিনেট করা বলতে বোঝায় বইয়ের পাতাকে নক্সা দিয়ে সুন্দর ক'রে তোলবার অঙ্কনপদ্ধতি। খুব পুরোনো আর্ট বিলেতের। মিসেস মার্টিনডেলের সেই ছবি, দিল্লির ইন্দ্রসভার সেই নক্সা, আর মোগলযুগের সেই প্রাচীন চিত্রগুলি অবনীন্দ্রনাথকে নতুন ক'রে আঁকতে অনুপ্রেরণা জোগাল।

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয়-শিল্পের পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন।

প্রাচীন-যুগের সেই বর্ণ-বৈচিত্র্য, সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন তাঁর শিল্পী-মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। তিনি সেই মোগলচিত্রের ধারা অনুসরণ ক'রে রাধাকৃষ্ণের বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে চণ্ডীদাসের 'অভিসার'এর কবিতা—

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিমকর, হিম করু বন্দ॥

পৌষের শীতের রাত্রে শ্রীরাধিকা চলেছেন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে। এই বিষয়-বস্তু নিয়ে তিনি আঁকলেন রাধার 'অভিসার'-চিত্র। কিন্তু সে ছবি এঁকে তাঁর তৃপ্তি হ'লো না। তাঁর মনে হ'লো—সে যেন মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে শীতের রাত্রে পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাধিকার ছবি তা হয়নি। দেশী টেক্‌নিক্ শেখা দরকার।

এই প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"তখনকার দিনে রাজেন্দ্র-মল্লিকের বাড়িতে এক মিস্ত্রি ফ্রেমের কাজ করে। লোকটির নাম পবন, আমার নাম অবন। তাকে ডেকে বল্লুম—ওহে সাঙাত, পবনে অবনে মিলে গেছে, শিখিয়ে দাও এবার সোনা লাগায় কি-ক'রে। সে বল্লে—সে কি বাবু, আপনি ও কাজ শিখে কি করবেন। আমাকে বলবেন, আমি ক'রে দেবো।"

অবনীন্দ্রনাথও ছাড়লেন না। তিনি পবনকে বললেন—"না হে, আমার ছবিতে আমিই সোনা লাগাব; আমাকে শিখিয়ে দাও।"

পবনের কাছ থেকে তখন শিখলেন কি-ক'রে সোনা লাগাতে হয় ছবিতে। বৈষ্ণব পদাবলীর কতকগুলি ছবিতে সোনা-রুপোর তবক বসিয়ে তিনি এঁকে ফেললেন। "তারপর আঁকা শুরু করলেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র বিষয় নিয়ে। এমনি ক'রে এক একখানা পুরোনো বই ধ'রে তিনি তার রূপ দিয়ে যাচ্ছেন অপরূপ ক'রে। তখন তাঁর সে কী উৎসাহ, কী আনন্দ। ছবি আঁকার নেশায় তখন রাতদিন বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি।

অবনীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ বিখ্যাত ছবি-ই হচ্ছে মোগল-যুগের ইতিহাস থেকে আঁকা—যেমন, শাজাহানের স্বপ্ন, শাজাহানের মৃত্যু, আলমগীর, আওরঙ্গজেব ও দারার ছিন্নমুণ্ড প্রভৃতি।

লেখার সমালোচনা যেমন লিখে করা যায়, ছবি কি রকম ভালো, কেন ভালো, তা কিন্তু লিখে ঠিক বোঝানো যায় না। ছবির উৎকর্ষ ধরা পড়ে কেবল তার কাছেই, ছবি যে দেখতে জানে; সে-ই বোঝে ছবির যথার্থ নৈপুণ্য কোথায়। তাই, অবনীন্দ্রনাথের ছবি কার দৃষ্টিতে কি রকম ভাবে ধরা দেবে তা' বলা শক্ত।

'শাজাহানের মৃত্যু' ছবিখানি অবনীন্দ্রনাথের একখানি শ্রেষ্ঠ ছবি। কাঠের ওপর তেলরঙে আঁকা। শাজাহানের মৃত্যুসময়ের বিষাদের ভাবখানি ফুটে উঠেছে অতি করুণভাবে। অবসন্ন দেহে শয্যায় শুয়ে শাজাহান, পায়ের কাছে ব'সে তাঁর বড় আদরের মেয়ে জাহানারা,—দূরে তাজমহল। শাজাহান করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সেই দিকে। সমস্তটা জড়িয়ে এক অব্যক্ত বেদনা ফুটে উঠেছে সেই চিত্রে। অবনীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন এই ছবি আঁকবার সময় তাঁর মনে একটা অপূর্ব তন্ময়তা এসেছিল।

এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—"এ ছবিটি এত ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুতে যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম। 'শাজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষা'তে যত আমার বুকের ব্যথা সব উজাড় ক'রে ঢেলে দিলুম।"

আর একখানি ছবি 'আলমগীর'। পরিণত বয়সে এই ছবিখানিই অবনীন্দ্রনাথের আঁকা সবচেয়ে বড় ছবি। সাদা পোশাক, সাদা দাড়ি নিয়ে

বৃদ্ধ আলমগীর দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে হাত রেখে। হাতের মুঠোয় জপের মালা আর তরবারি দুইই ধরা। ঠিক যেন ইতিহাসের সেই চরিত্রের হুবহু প্রতিচ্ছবি। সূক্ষ্ম তুলির রেখায় তা অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

'অশোক-মহিষী' বা 'তিষ্যরক্ষিতা'—অবনীন্দ্রনাথের একখানি বিখ্যাত ছবি। দিল্লি-দরবারের সময় সম্রাট পঞ্চমজর্জ যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন সম্রাজ্ঞী কুইন মেরী অবনীন্দ্রনাথের এই ছবিখানা দেখে বিশেষভাবে প্রশংসা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তখন লেডি হার্ডিঞ্জের মারফতে এই ছবিখানি কুইন মেরীকে 'নজর' হিসেবে পাঠিয়ে দেন। লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ 'বাকিংহাম-প্যালেস'-এ ছবিখানি বিশেষ যত্নের সঙ্গে রাখা হয়।

অবনীন্দ্রনাথের আর একখানি সুবিখ্যাত ছবি—'শেষ বোঝা'। মরুভূমির ওপর একটি উট শুয়ে পড়েছে, আর সে চলতে পারে না, আয়ু তার ফুরিয়ে এসেছে—সেই দৃশ্যের অদ্ভুত চিত্রণ। পিছনে একটা লাল রঙে দিবাবসানের ইঙ্গিত, সেই সঙ্গে জীবন-সায়াহ্নের আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমন ছবি আর দ্বিতীয় কেউ আঁকেন নি।

ছবিখানি বিদেশে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছিল। ফ্রান্সের বিখ্যাত ল্যুভার মিউজিয়ম অবনীন্দ্রনাথের এই ছবিখানা কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দর শুনে শিল্পীর মনে হ'লো ক্ষোভ। তিনি ছবি দিতে চাইলেন না মিউজিয়মে। একজন বিদেশী বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন—"তুমি কী বোকামি করছো! দিয়ে দাও ছবি-খানা। বিশ্ববিখ্যাত মিউজিয়মে তোমার ছবি থাকবে এ তো তোমার আনন্দের কথা।" কিন্তু আরেকজন বিদেশী বন্ধু বলেছিলেন—"না, টেগোর, তুমি ঠিকই করেছো, ও ছবি তুমি ও-দরে দিয়ো না।"

প্রথম বন্ধুটি ব্যবসায়ী আর দ্বিতীয়টি আর্টিস্‌ট্।

ল্যুভার মিউজিয়ম সেদিন ভারতীয় ছবি ব'লেই বেশি দাম দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সে-ছবি কিনতে চায় নি। এটুকু বুঝতে পেরেই অবনীন্দ্রনাথ সেদিন বেঁকে বসেছিলেন। নইলে অর্থের প্রতি কোনদিনই তাঁর এতটুকু মোহ নেই।

এই প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন যে, মিউজিয়ম-কর্তৃপক্ষ যদি ছবি-খানা ভিক্ষে ক'রে নিতেন, তিনি খুশি মনে বিনামূল্যেই দিয়ে দিতেন। কিন্তু দর-কষাকষি যখন করলে, তখন আর্টিস্‌টেরও একটা আত্মসম্মান থাকা চাই।

বিলেতের হ্যারপ কোম্পানির অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ 'ওমর-খৈয়াম'-এর

অনেকগুলি ছবি আঁকেন। সেই ছবিগুলি ঐ হারপ কোম্পানির প্রকাশিত 'ওমর-খৈয়াম' বইখানিতে ছাপা হয়। বলা বাহুল্য যে তার প্রত্যেকটি ছবিই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পনৈপুণ্যে অপরূপ ও অসামান্য হয়ে উঠেছে।

বাংলার পল্লীগ্রামেরও তিনি বহু ছবি এঁকেছেন। শাহজাদপুরের জমিদারি থেকে ফিরে তিনি অনেকগুলি পল্লীদৃশ্যের ছবি আঁকেন। পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক রূপ সেগুলির মধ্যে দিয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে। দেশবিদেশের বহু গুণী ও জ্ঞানী অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসে এই ছবিগুলি দেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে গেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কত কল্পনাকে রূপ দিয়েছেন, কত অব্যক্ত বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তুলির রেখায় তার কি কোনো হিসাব আছে। তবু তাঁর শিল্পের ভাণ্ডারের দিকে চোখ মেলে তাকালে প্রথমেই যে ছবিগুলি তাদের অসামান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে ওঠে চোখের সামনে সে হচ্ছে—শাজাহানের মৃত্যু, শাজাহানের স্বপ্ন, আলমগীর, শেষ বোঝা, কচ ও দেবযানী, কাজরী, ওমরখৈয়াম, বিরহী যক্ষ, আকাশপথে সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা, পুথিপাঠক, বীণাবাদিনী, সবুজ ওড়না, কাল-বৈশাখী, ত্রয়ী, হুয়েনশাঙ, নিমাইপণ্ডিতের টোল, তিষ্যরক্ষিতা, বুদ্ধ ও সুজাতা, ভগীরথ, আওরঙ্গজেব ও দারার ছিন্নমুণ্ড, দেবদাসী, পুরীর সমুদ্রতটে শ্রীচৈতন্য, যমুনাতীরে, বাঁশির ডাক, ঋতুসংহার, ভারতমাতা—প্রভৃতি।

এই 'ভারতমাতা' ছবিখানি অবনীন্দ্রনাথের আর একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র। এই চিত্রের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১৩১৩ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে সিস্টার নিবেদিতা লিখেছিলেন—"এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্র-শিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়।...চিত্রপটে তৎকর্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি ভারতের জিনিস; আকার-প্রকারও ভারতীয়। পদ্মগুলির বক্র-রেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভামণ্ডলের শুভ্র দীপ্তি সংযোগে এশিয়োদ্ভূত কল্পনাজাত মূর্তিটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চারি বাহু দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্ন-স্বরূপ। ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে—ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী অন্নদামায়ের আত্মাকে—দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যে-রূপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মায়ের রূপে শিল্পী কী দেখিয়াছেন

তাহা এই চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশদ হইয়া গিয়াছে।—কুহেলিকার মত অস্পষ্ট পদ্মরাজি ও শ্বেত আভা এবং তাঁহার চারিবাহু অনন্ত প্রেমেরই মত তাঁহাকে অতিমানব করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহার শাঁখা, তাঁহার সর্বদেহাচ্ছাদক পরিচ্ছদ, তাঁহার খালি পা, তাঁহার খোলা অকপট মুখের ভাব, এই সকলে তিনি কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের হৃদয়, একাধারে ভারতের মাতা ও দুহিতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না—প্রাচীনকালের ঋষিদিগের নিকট বৈদিক ঊষা যেমন ছিলেন?”

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা সেখানেই, যে, তাঁর চিত্রপটের রেখা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুর সন্ধান আমরা পাই ; অনেক অনুভূতিকে তিনি এমন ক'রে রূপ দেন, যা দেখে বিস্ময়ে শুধু চেয়েই থাকতে হয়, তর্ক করা চলে না। ছোটদের চোখে তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলি হয়তো তেমন কোনো বিস্ময় নিয়ে দেখা দেবে না, কিন্তু সেই ছোটরা যখন বড় হবে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও যখন পরিবর্তন হবে তখন তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পাচার্য কেন বলা হয়, কোথায় তাঁর চিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য।

অবনীন্দ্রনাথ কখনো একই রাস্তা ধ'রে ছবি আঁকেননি। কাগজে, কাপড়ে, কাঠের ওপর—যখন যেভাবে সুবিধে মনে করেছেন তখন সেইভাবেই এঁকেছেন। 'শাজাহানের মৃত্যু' ছবিখানি তো কাঠের ওপর তেল-রঙে আঁকা। তাছাড়া সব রকম কাগজে, সব রকমের রঙেই তিনি আঁকতে অভ্যস্ত। বাংলার পুরোনো পটের ধরনে তিনি বহু ছবি এঁকেছেন কাপড়ের ওপর। কোনো এক শিল্পী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—“বরাবরই আমরা দেখেছি তিনি খেলার ছলে রঙ তুলি নিয়ে কাজ করছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নানান্ ধরন আপনিই তাঁর চিত্রপটে গজিয়ে উঠছে। সেইজন্য তাঁর প্রতিভা মাস্টারি করবার মত একটা মাপকাঠি বা নিয়মপ্রণালী নিয়ে শিষ্যদের ব্যতিব্যস্ত করেনি।”

শিল্পগুরু

ভারতীয় শিল্পের চর্চা ক'রে আজ যে-সব শিল্পী ভারতের নানা জায়গায় দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েছেন, শিক্ষকতা করছেন, তাঁরা একদিন সকলেই অবনীন্দ্রনাথের কাছে ব'সে চিত্রাঙ্কন শিখেছেন, তাঁরা সকলেই অবনীন্দ্র-নাথের শিষ্য।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত-শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এখন শান্তিনিকেতনের কলাভবনের শিল্পাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার লক্ষ্ণৌ-এর কলেজ অব আর্টসের অধ্যক্ষ। স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন কর, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুল দে প্রভৃতি অনেকেই তাঁর সুযোগ্য প্রতিভাবান শিষ্য।

বিখ্যাত শিল্পী হ্যাভেল সাহেব যখন কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, সেই সময়েই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভার কথা লোকের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হ্যাভেল-সাহেব ছিলেন গুণগ্রাহী। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি তাঁকে আর্ট-স্কুলের সহকারী-অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন।

অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে যেতে রাজি হননি, তাছাড়া মায়ের অনুমতি না পেলে তিনি চাকরি করবেন না এই ছিল প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সাহেব তাঁকে ছাড়লেন না। অবনীন্দ্রনাথের মাকে ব'লে আর্ট-স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের কাজ তাঁকে দিলেন। সালটা সম্ভবত ১৯০৫ খ্রীঃ-অব্দ। তারপর ১৯০৬ খ্রীঃ-অব্দে হ্যাভেল সাহেবের অবসর গ্রহণের পরে তিনিই আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষ হন।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯০৯ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথই ছিলেন গভর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলের কর্ণধার। এই সময়ে

তিনি শিল্পী নন্দলাল ও সুরেন গাঙ্গুলিকে নিয়ে ভারতীয় চিত্রকলার চর্চা পুরোদমে শুরু করেন।

সিস্টার নিবেদিতা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের পরমবন্ধু। তিনিই শিল্পী নন্দলালকে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ক'রে অজন্তায় পাঠান। তার আগেই এসেছিলেন শিল্পী সুরেন গাঙ্গুলি। তিনিই অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র।

তাছাড়া বাংলার বাইরে মহীশূর থেকে এসেছিলেন বাংকটাপ্পা, লক্ষ্ণৌ থেকে হাকিম খান, লঙ্কাদ্বীপ থেকে নাগাহাওয়াত্তা, যুক্তপ্রদেশ থেকে শিল্পী শমিউজ্জমা, তাঁর শিষ্য হয়ে। তাছাড়া জাপান থেকে শিল্পী টাইকান আর হিশিদা এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় আর্ট শিক্ষা করতে।

উত্তরকালে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এক একজন শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন ভারতের এক একটি জায়গায় শিল্প-শিক্ষার ভার দিয়ে। নন্দলাল গেলেন শান্তিনিকেতনে, সমরেন্দ্রনাথ লাহোরে, সিংহলে মণীন্দ্রভূষণ, অন্ধ্রে শৈলেন্দ্রনাথ, লক্ষ্ণৌয়ে অসিতকুমার, দেবীপ্রসাদ মাদ্রাজে। কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষতার ভার পেলেন শিল্পী মুকুল দে। এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মারফতে ভারতবর্ষ অবনীন্দ্রনাথের সত্যিকারের পরিচয় পেলে, সেই সঙ্গে ফিরে পেলে ভারতের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন শিল্প-কলার অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

নন্দলালই হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথের প্রিয়তম-শিষ্য। তাঁকে তিনি হাতে ধ'রে দেখিয়ে দেখিয়ে কখনো ছবি আঁকতে শেখাননি। তিনি দিতেন ভাব, নন্দলাল দিতেন তার রূপ। তারই ওপর রঙের কয়েকটি প্রলেপ দিয়ে বা একটু-আধটু ভুল শুধরে দিয়ে তিনি ছেড়ে দিতেন। শিষ্যদের প্রতিভার উপরে তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ।

নন্দলালের প্রসঙ্গে একজায়গায় তিনি লিখেছেন—"ছাত্রকে তার নিজের ছবি সম্বন্ধে মাস্টারের কিছু বাতলানো—এক সময়ে তার বিপদ বড়, আর তাতে মাস্টারেরও কি কম দায়িত্ব? একবার কি হয়েছিল বলি। নন্দলাল একখানা ছবি আঁকলো 'উমার তপস্যা'। বেশ বড়ো ছবিখানা। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে উমা শিবের জন্যে তপস্যা করছে, পিছনে মাথার উপরে সরু চাঁদের রেখা। ছবিখানিতে রঙ বলতে কিছুই নেই, আগাগোড়া ছবিখানায় গৈরিক রঙের অল্প অল্প আভাস। আমি বল্লুম, 'নন্দলাল, ছবিতে একটু রঙ দিলে না? প্রাণটা যেন চড়্‌বড়্‌ করে ছবিখানির দিকে তাকালে। আর কিছু না দাও, অন্তত

উমাকে একটু সাজিয়ে দাও। কপালে একটু চন্দন-টন্দন পরাও, অন্তত একটি জবাফুল।' বাড়ি এলুম, রাত্রে আর ঘুম হয় না। মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগলো, 'আমি কেন নন্দলালকে বলতে গেলুম ওকথা। আমার মতন ক'রে নন্দলাল হয়তো উমাকে দেখেনি। ও হয়তো দেখেছিলো উমার সেই রূপ, পাথরের মত দৃঢ়, তপস্যা ক'রে ক'রে রঙ রস সব চ'লে গেছে। তাই তো উমার তপস্যা দেখে বুক ফেটে যাবারই কথা।—তখন আর সে চন্দন পরবে কি।' ঘুমুতে পারলুম না, ছট্‌ফট্‌ করছি কখন সকাল হবে। সকাল হ'লেই ছুটলুম নন্দলালের কাছে। ভয় হচ্ছিল পাছে সে রাত্রেই ছবিখানাতে রঙ লাগিয়ে থাকে আমার কথা শুনে। গিয়ে দেখি নন্দলাল ছবিখানাকে সামনে নিয়ে ব'সে রঙ দেবার আগে আর একবার ভেবে নিচ্ছে।

"আমি বল্লুম, 'কর কি নন্দলাল, থামো থামো, কি ভুলই আমি করতে যাচ্ছিলুম। তোমার উমা ঠিকই আছে। আর হাত লাগিয়ো না।'

"নন্দলাল বল্লে, 'আপনি ব'লে গেলেন উমাকে সাজাতে। সারারাত আমিও সে-কথা ভেবেছি, এখনো ভাবছিলুম রঙ দেবো কি না।'

" 'কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলুম বলো দেখি। আর একটু হ'লেই অত ভালো ছবিখানা নষ্ট ক'রে দিয়েছিলুম আর কি।' সেই থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি। আর এটা জেনেছি যে, ছবি যার-যার নিজের সৃষ্টি, তাতে অন্য কেউ উপদেশ দেবে কী।"

অবনীন্দ্রনাথের এইখানেই বিশেষত্ব। শিল্পীর প্রতিভার সম্মানই তাঁর কাছে বড় জিনিস, তা সে বয়সে ছোট-ই হোক বা শিষ্যই হোক।

অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের একটা ব্যবধান রেখে কোনদিনই চলেননি। শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। তাদের সঙ্গেই তিনি ব'সে যেতেন ছবি আঁকতে। বারান্দার একদিকে বসতেন তিনি, আর একদিকে ব'সে যেত ছাত্রের দল। তারই মধ্যে কত লোক আসছে যাচ্ছে; গুরু-শিষ্যের ছবি আঁকাও চল্‌ছে পুরোদমে। আবার মাঝে মাঝে গানও চল্‌ছে গল্পগুজবও হচ্ছে। এই রকম হট্টগোলের মধ্যে ছবি এঁকেই তিনি অভ্যস্ত।

ছবি আঁকতে আঁকতে অবনীন্দ্রনাথ কখন যে শিষ্যদের সঙ্গে গল্পে মেতে গেছেন তার ঠিক নেই। কিন্তু সেই গল্প-গুজবের মধ্যেই শিষ্যেরা অনেক কিছু জানতে পারতেন, শিখতে পারতেন।

এই গল্পচ্ছলেই তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে এদেশের, ইউরোপের, জাপানের, আমেরিকার বিভিন্ন যুগের শিল্পকলার ইতিহাস বলে যেতেন। গুরু-গম্ভীর বক্তৃতার বদলে সরস ক'রে বলা এমনধারা শিল্প-ইতিহাস শুনতে কার না ভালো লাগে।

ধরাবাঁধা কোনো নিয়মের মধ্যে দিয়ে তিনি চলতেন না। সুযোগ ও সুবিধা মত ছাত্রদের ডেকে নিয়ে গল্প করতেন। সেই গল্প থেকেই তাদের হ'ত আসল শিক্ষা।

শিল্পীর বড়গুণ হ'লো দৃষ্টি। দু'চোখে যা-কিছু যেমনটি এসে ধরা দিচ্ছে তাকে ঠিক সেইভাবেই রূপ দিতে হয় চিত্রে, তবেই তা অপূর্ব হয়ে ওঠে। যে যত দেখতে শিখেছে সে তত ভালো শিল্পী হবে। দেখতে শেখাই হ'লো আঁকতে শেখার প্রথম ধাপ।

কোনো একজন শিল্পী একদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বললেন যে তিনি তাঁর কাছে ছবি আঁকা শিখবেন। শিল্পগুরু বললেন—"তা তো শিখবে, কিন্তু কিছু এঁকেছো কি? দেখাও না।" তিনি তাঁর আঁকা দুর্গার একখানি ছবি তাঁকে দেখালেন। সাধারণত দুর্গার ছবি যেমন হয়, শিল্পীটি তেমনি এঁকে নিয়ে এসেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—"তা দুর্গা যে এঁকেছো, কি ক'রে আঁকলে শুনি?'

শিল্পী বললেন—"ধ্যানে ব'সে একটা রূপ ঠিক ক'রে নিয়েছিলুম। পরে তাই আঁকলুম।"

অবনীন্দ্রনাথ সে-কথা শুনে হেসে জবাব দিলেন—"তা হবে না। ধ্যানে দেখলে চলবে না, চোখ খুলে দেখতে শেখো, তবেই ছবি আঁকতে পারবে। যোগীর ধ্যান আর শিল্পীর ধ্যানে এইখানে তফাৎ।"

ভারতের শিল্পী

প্রাচীন ভারতের শিল্পকলাকে পুনর্জীবন দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ হ'লেন মনে প্রাণে খাঁটি ভারতের শিল্পী।

ভারতের বাইরে তিনি যাননি। কিন্তু তাঁর শিল্পপ্রতিভার সমাদর হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। দেশ-বিদেশের শিল্পীরা এসেছেন ভারতের এই শিল্পী-মনীষীর কাছে। জাপান থেকে এসেছেন প্রসিদ্ধ-শিল্পী ওকাকুরা, বিলেত থেকে এসেছেন অধ্যাপক শিল্পী রোদেনষ্টাইন, রাশিয়া থেকে এসেছেন সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও শিল্পী নিকোলাস রোরিক, প্যারিস থেকে এসেছেন বিদুষী শিল্পী কারুকুশলা মাদাম কারপ্লে, পোলাণ্ড থেকে এসেছেন সেখানকার প্রসিদ্ধ চিত্রকর কার্লমিকফ, নরওয়ে থেকে এসেছেন শিল্পী মাডসেন।

এইরকম দেশবিদেশের খ্যাতনামা শিল্পী ভারতবর্ষে এলেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে গেছেন, বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে মুগ্ধ হয়েছেন।

লর্ড কারমাইকেল ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলার পরম অনুরাগী, তাঁর বন্ধুত্বলাভেও তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি অবনীন্দ্রের বহু ছবির স্থান দিয়েছেন তাঁর চিত্র-সংগ্রহের মধ্যে। তিনিই ইউরোপের প্রথম-মহাযুদ্ধের আগে অবনীন্দ্রনাথ ও সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন ভারতীয় শিল্পীর ছবি বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। লর্ড কারমাইকেলের নিজের অনেক জিনিসের সঙ্গে, সেই সব ছবি জাহাজডুবি হয়ে ভূমধ্যসাগরের অতল তলায় তলিয়ে যায়। অনেক দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন তিনি এই জন্যে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ দুঃখের মধ্যেও ভেঙে পড়েন না। তাই সেদিন শিল্পী-নন্দলালকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"ভালোই হয়েছে, এতে দুঃখ কি। আমি দেখছি জলদেবীরা আমাদের ছবিগুলো বরুণালয়ে টাঙিয়ে আনন্দ করছেন!"

লর্ড হার্ডিঞ্জ আর তাঁর স্ত্রীও ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ শিল্পানুরাগী। ১৯১০-১১ সালে তাঁরা গভর্ণমেন্ট আর্টস্কুল দেখতে আসেন। সেখানে শিল্পগুরু

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের আঁকা ভারতীয় চিত্রের নমুনা দেখে তাঁরা বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ হন। ভারতীয়-শিল্পে যে এত সৌন্দর্য থাকতে পারে এর আগে তাঁরা তা ভাবতে পারেননি ব'লেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

১৯১১ সালের বিখ্যাত দিল্লি-দরবার।

সেখানে ছবির এক প্রদর্শনী হ'লো। হ্যাভেল-সাহেব অবনীন্দ্রনাথের দু'খানি ছবি পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। একখানি—'শাজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষা', আর-একখানি তাজমহল নির্মাণের দৃশ্য।

বলা বাহুল্য, ছবি দু'খানি সেই শিল্প-প্রদর্শনীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। আর, দিল্লি-দরবার থেকে রৌপ্যপদক পুরস্কার এলো শিল্প-গুরুর হাতে। ঐ ছবি দু'খানাই আবার, কংগ্রেস-শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সেখান থেকে এলো স্বর্ণপদক,—শিল্পীর সম্মান আসতে লাগল নানাদিক থেকে।

তারপর অবনীন্দ্রনাথ একদিন পরিচিত হ'লেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরীর সঙ্গে। কলকাতায়—লর্ড হার্ডিঞ্জের মধ্যস্থতায় এই সাক্ষাৎ ঘটল। সম্রাট-দম্পতি তাঁর আঁকা ছবির অজস্র প্রশংসা করলেন। এই সাক্ষাতের দু' এক বছর পরেই এলো রাজার সম্মান। অবনীন্দ্রনাথ সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হ'লেন।

ভারতীয়-শিল্প এবং সেই সঙ্গে প্রাচ্যশিল্প যাতে বিশ্ব-শিল্পের দরবারে সমাদর পায় সেজন্যে শিল্পগুরু প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন।

১৯০৭ সালে অবনীন্দ্রনাথ আর শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান সোসায়েটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস্' স্থাপিত হয়। লর্ড কিচ্‌নার ছিলেন সেই সমিতির সভাপতি আর অবনীন্দ্রনাথ তার সম্পাদক।

এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ একজায়গায় বলেছেন—"আমরা করেছিলুম এমন একটা সোসায়েটি, যেখানে দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সবাই একত্র হয়ে আর্টের উন্নতির জন্যে ভাববে। শুধু ভারতীয় শিল্পই নয়, প্রাচ্যশিল্পের সবকিছু জিনিস দেখানো হবে লোকদের।"

শিল্পানুরাগী ভারতীয়, ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এই সোসায়েটির আজীবন সদস্য। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—ভগিনী নিবেদিতা, লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রোনাল্ড্‌সে, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, এডউইন মণ্টেগু, মিস্ কার্প্লে, স্যর জন্ হোমউড, মিঃ ব্লাণ্ট, স্যর জন্ উডরফ, মিঃ পণ্টেন মুলার প্রভৃতি।

এই সোসায়েটিই ছিল অবনীন্দ্রনাথের ধ্যানজ্ঞান। আর্টস্কুলের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ ক'রে ১৯১৫ সালে তিনি ঐ সোসায়েটির কাজে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োগ করেন। অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই সমিতি ক্রমশ উন্নতি লাভ করে। বহু শিল্পী এই সমিতির সভ্য হয়ে প্রাচ্যশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। এই সমিতির প্রদর্শনীর মারফৎ-ই অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের শিল্পকলা বিশেষভাবে প্রচারিত হবার সুযোগ লাভ করে।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া সোসায়েটি'র প্রতিষ্ঠার সময় অবনীন্দ্রনাথ ভারতে থেকেই তার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হয়ে ঐ সমিতি গড়বার কাজে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

ভারতীয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দেশীয় শিল্পের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁকে সব-দিক থেকেই পুরোদস্তুর স্বদেশী হ'তে হবে; খাঁটি স্বদেশী আবহাওয়া না থাকলে, স্বদেশী শিল্পচর্চায় অনেক গলদ থেকে যাবে।

তাছাড়া ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে স্বদেশীযুগের যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জেগেছিল, সেই জাতীয়-অনুপ্রেরণায় তিনিও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

একজায়গায় তিনি বলেছেন—"যখন আমাদের ভারতশিল্পের জোর চর্চা চলছে, তখন ভাবলুম, শুধু ছবিতে নয়, সব দিকেই এর চর্চা করতে হবে। লাগলুম আসবাবের দিকে, ঘর সাজাতে, আশেপাশে চারদিকে ভারতশিল্পের আবহাওয়া আনতে।"

বাড়িতে যত পুরোনো আসবাব-পত্র ছিল—বিদেশী চেয়ার-টেবিল, পরদা, ফুলদানি—সব বিক্রি করা শুরু হ'লো। মাদ্রাজ থেকে মিস্ত্রি এলো ধনকোটি আচারি। তাকে দিয়ে খাঁটি দিশি ধরনের দিশি আসবাব তৈরি করানো শুরু হ'লো। সব কিছুই ভারতীয়, সব কিছুই প্রাচ্য। বিলিতির নামগন্ধও রইল না কোথাও।

আজকাল অনেক বনেদী পরিবারে, শৌখিন বসবার-ঘরে দিশি ঢঙের আসবাবপত্র দেখা যায়, বিশেষ ক'রে শান্তিনিকেতনেরই প্রভাব তার মধ্যে। কিন্তু এই আদর্শের একদিন গোড়া-পত্তন করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ।

অবনীন্দ্রনাথের চেস্টাতেই ভারতীয় শিল্পের নানান রকম জিনিস সংগৃহীত হ'য়ে গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের একটি পৃথক আর্ট-গ্যালারির সৃষ্টি হয়। তাঁর

উদ্যোগেই প্রাচ্যদেশের নানা জায়গা থেকে কাচের বাসন, কার্পেট, ভালো ভালো ছবি, পুতুল, গয়না সংগৃহীত হয়ে শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হ'ত। দিল্লী থেকে হয়তো এলো মাটির বাসন-কোসন; কাশ্মীর থেকে এলো সূক্ষ্ম কারুকাজ করা নানা রকমের শাল ও অন্যান্য হাতের কাজ, বড় বড় কার্পেট; কৃষ্ণনগর থেকে এলো মাটির মূর্তি, খেলনা, পুতুল; লক্ষ্ণৌ থেকে তাস; বোম্বে থেকে বাদশা-বেগমের মিনিয়েচার-আঁকা ছবি। এইভাবে আসত উড়িষ্যার পট, গঞ্জামের হাতির-দাঁতের মূর্তি, এবং ভারত, চীন, জাপানের নানা জায়গা থেকে নানা-রকমের প্রাচ্য-শিল্পকলার নিদর্শন।

চিত্রশিল্প ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় অন্যান্য শিল্পের দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে এদেশের গৃহশিল্পের মধ্যে একটা সাড়া জাগে, Bengal Home Industry (বঙ্গীয় গৃহশিল্প)-র পত্তন হয়। নিজের হাতে তিনি গহনার নক্‌শা, আসবাবপত্রের নক্‌শা এঁকে দিয়েছেন। তাছাড়া এক সময় তিনি যশোহর ও অন্যান্য জায়গা থেকে কাঁথা ও আল্‌পনার নমুনা আনিয়ে কলকাতার লোকসমাজে তার প্রচলন করেন।

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের সম্পদ বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাঁর শিষ্যদের মাঝে-মাঝে ভারতের নানা প্রদেশে পাঠাতেন। নন্দলালকে পাঠিয়েছিলেন অজন্তায়। অজন্তার গিরিগুহায় প্রাচীনভারতের যে অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন আছে, নন্দলাল তারই অনুকরণ ক'রে আনলেন সেখান থেকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তিনি ভ্রমণ করেছেন এশিয়ার বহু দেশে। এইভাবে গুরুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহের ফলেই নন্দলাল বিশ্বশিল্পের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পান।

ভারতের এই শিল্পাচার্য ভারতের গৌরব, আমাদের গৌরব। অবনীন্দ্রনাথ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহিমা উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন ভারতীয় শিল্পকলার পুনঃপ্রবর্তন ক'রে। ১৯২১ সালে স্যর আশুতোষ তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাগীশ্বরী-অধ্যাপক'-এর পদে নিযুক্ত ক'রে তাঁর প্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে গেছেন। সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ শিল্প সম্বন্ধে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাঁর সেই 'বাগীশ্বরী-বক্তৃতাবলী' চিরদিন উৎকৃষ্ট শিল্প-সাহিত্য হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হবে। আট বৎসর ধ'রে অবনীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 'বাগীশ্বরী-অধ্যাপক'-এর পদে নিযুক্ত থেকে শিল্প বিষয়ে অমূল্য সব বক্তৃতা দিয়ে গেছেন।

জাপানের শিল্পীদের কাছে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ শিল্পী অসীম শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। সেখানকার সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও চিত্রসমালোচক কাকুজো ওকাকুরা অবনীন্দ্রনাথের গুণগান করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই শ্রেণীর শিল্পী পৃথিবীতে ৫০০ বৎসরে মাত্র একবারই জন্মগ্রহণ করে। আমাদের শিল্পী সম্বন্ধে এইরকম উক্তি শুধু শিল্পীর গৌরবই বৃদ্ধি করে না, সেই সঙ্গে তাঁর স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরবও বাড়িয়ে তোলে।

বিখ্যাত জাপানী-শিল্পী টাইকানও মন্তব্য করেছেন যে, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কণ-পদ্ধতি হয়তো আয়ত্ত করা সম্ভব, কিন্তু তাঁর কল্পনাশক্তির নাগাল পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাঁর সেই অসামান্য কল্পনাশক্তিকে একমাত্র তিনিই রূপ দিতে পারেন।

পৃথিবীর সব দেশেই ভারতের এই শিল্পস্রষ্টার আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। চীন, জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি বড় বড় সব দেশই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে আর্ট-গ্যালারি সাজিয়েছে। ভারতের শিল্পী বিশ্বশিল্পীর দরবারে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। আমাদের পক্ষে এ বড় কম গৌরব ও আনন্দের বিষয় নয়।

কথা-শিল্পী

অবনীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন চিত্রশিল্পী, অন্যদিকে তেমনি বিখ্যাত কথা-শিল্পী। তুলির রেখায় তিনি রূপ দিয়েছেন কল্পনাকে, কালির রেখায় কাহিনীকে। তাঁর তুলিতে যেমন আছে জাদু, তাঁর লেখায় তেমনি আছে মধু। তুলিতে তিনি জাদুকর, লেখায় তিনি মধুকর।

বড়দের সাহিত্য নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি, তিনি চেয়েছেন শিশু ও কিশোরের মন ভোলাতে। তিনি বুঝেছেন শিশুরা কী চায়, কিশোরদের কিসের আকাঙ্ক্ষা। শিশু ও কিশোরের সাথী অবনীন্দ্র তাই লিখেছেন এমন সহজ মধুর ভাষায়, এমন সব কথা ও কাহিনী, যার মধ্যে শিশু ও কিশোরের দল তাদের পরিচিত পৃথিবীকে খুঁজে পেয়েছে। তাই তো অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা',

'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজ-কাহিনী', 'বুড়ো-আংলা', 'ভূতপত্রীর দেশ' বাঙলার কিশোর-জগতের আনন্দের খনি।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা হ'লো গল্প বলার ভাষা, যে ভাষা শুনতে পাওয়া যায় ঠাকুমা-ঠানদিদের মুখে। এ ভাষার এমনি জাদু যে, পাঠক বা শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শুধু প'ড়ে যায় বা শুনে যায়, তা নিয়ে তর্ক করবার ফুরসৎ পায় না।

অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের যুগেই বাংলা সাহিত্যে এমন এক ভাষার সৃষ্টি করলেন যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব, যার ওপর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো প্রভাব পড়েনি। অবনীন্দ্রনাথের রচনার প্রধান বিশেষত্ব এইখানেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই একদিন অবন ঠাকুর গল্প লিখতে বসেন। প্রথমটা তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁর হাত দিয়েও সাহিত্য-সৃষ্টি হবে। এই কথা বলতে গিয়ে তিনি একজায়গায় বলেছেন—"গল্প লেখা আমার আসতো না। রবিকা-ই আমার গল্প-লেখার বাতিকটা ধরিয়েছিলেন।"

ধরিয়ে তিনি ভালোই করেছিলেন, তা নইলে হয়তো আমরা এমন সুন্দর সুন্দর লেখা থেকে বঞ্চিত হ'তাম।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম বই 'শকুন্তলা'।

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সেই পুরোনো কাহিনী। কিন্তু কী চমৎকার ক'রেই তিনি ব'লে গেছেন সেই গল্প। তিনি জানতেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শিশু ও কিশোর শ্রোতার দল। তাদের মন জয় করতে হ'লে বলতে হবে সহজ সরল ভঙ্গীতে, কৌতূহল জাগিয়ে, কৌতুকের আমেজ দিয়ে।

তিনি সেইভাবেই বলেছেন ছোট মালিনী নদীর তীরে তপোবনের কথা, তপোবনের সৌন্দর্যের কথা, ঋষিবালকদের কথা। তিনি বলেছেন—

—কি তারা ক'রত? বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল, তাতে গাই-বাছুর চ'রে বেড়াত। বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল ঋষিরা খেলে বেড়াত।

কিশোর শ্রোতা হয়তো জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো—কি দিয়ে তারা খেলত?

তার জবাবে তিনি বলেছেন—কেন? তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল—ময়ূর গড়বার মাটি ছিল। বেণুবনের বাঁশি ছিল। বটপাতার ভেলা ছিল।

এমনি ক'রে তিনি ব'লে গেছেন তাপসকন্যা শকুন্তলার কথা। সেই সঙ্গে বলেছেন প্রিয়সখী অনসূয়া প্রিয়ংবদার কথা। সখীতে সখীতে কত ভাব,

কত গল্প, কত খেলা। তপোবনে তাদের কাজের অন্ত নেই। তারা গাছের গোড়ায় জল ঢাল্‌ছে, মল্লিকালতার বিয়ে দিচ্ছে। হরিণশিশুকে আদর করছে, হাতে ক'রে পদ্মের পাতায় জল খাওয়াচ্ছে। তারা হেসে গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে।

তপোবনের সেই স্নিগ্ধমধুর ছবিখানি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখার জাদুতে এক অপরূপ রূপ নিয়ে।

'ক্ষীরের পুতুল' বইখানিও অবনীন্দ্রনাথের একখানি অপূর্ব সৃষ্টি।

সুয়োরানী-দুয়োরানীর গল্প। "রাজবাড়িতে সুও-রানীর বড় আদর, বড় যত্ন। সুও-রানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন, সাত-শ' দাসী তাঁর সেবা করে—পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সুও-রানী রাজার প্রাণ।"

আর—দুয়োরানী ?

"দুও-রানী বড় রানী, তাঁর বড় অনাদর, বড় অযত্ন। রাজা বিষ-নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা; এক দাসী দিয়েছেন—বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন—জীর্ণ শাড়ি; শুতে দিয়েছেন—ছেঁড়া কাঁথা। দুও-রানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা ক'য়ে উঠে যান।"

শিশু-পাঠকের চোখ ছলছল ক'রে ওঠে এইটুকু শুনে। দুয়োরানীর জন্যে তার মনে ব্যথা জাগে। তারপর কী, তারপর কী হ'লো সে শুনতে চায় পরম আগ্রহে। লেখক ব'লে যান—রাজা বাণিজ্যে যাবেন, তাই গেলেন সুয়োরানী দুয়োরানীর কাছে। সুয়োরানী ফরমাশ করলেন—'হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি।' দুয়োরানী বললেন—'কোন্ লাজে গহনার কথা মুখে আনব ? মহারাজ, আমার জন্যে পোড়ামুখ একটা বাঁদর এনো।'

রাজা বাণিজ্য থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু সুয়োরানীর ফরমাশী একটা জিনিসও তাঁর পছন্দ হ'লো না।

"তখন মানিনী ছোটরানী আট-হাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশগাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে বললেন—ছাই গহনা! ছাই এ শাড়ি! কোন্ পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে ? মহারাজ, কোন্ দেশের ধুলোবালিতে এ মল গড়ালে ? ছি ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! এ কোন্ রাজকন্যার পরা শাড়ি!

দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা-শাড়ি পরা-গহনায় আমার কাজ নেই।

রানী অভিমানে গোসা-ঘরে খিল দিলেন।"

কিশোর-শ্রোতা বললে—তা বেশ হ'লো। কিন্তু দুয়োরানী?

দুয়োরানী রাজার আনা বানর-ছানাকে মানুষ করতে লাগলেন।

শিশু-পাঠক বললে—বাঃ বেশ তো। বানরছানা? তারপর?

দুয়োরানী কাঁদেন, আর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলেন সেই বনের বানরকে। "তখন সেই বনের বানর রানীর কোলে উঠে বসে, চোখের জল মুছে দিয়ে রানীকে বললে—মা, তুই কাঁদিস্‌নে—আমি তোর দুঃখ ঘোচাবো, তোর সাতমহল বাড়ি দেবো, সাতখানা পালঙ্ক দেবো, সাত-শ' দাসী ফিরে দেবো, তোকে সোনার-মন্দিরে রাজার পাশে রানী ক'রে কোলে নিতে সোনারচাঁদ ছেলে দেবো।"

এমনি ক'রে গল্প এগিয়ে চলে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীতে কিশোর পাঠক ভালোবাসে বানরছানাকে, দুঃখ করে দুয়োরানীর জন্যে, রাগে জ্ব'লে ওঠে সুয়োরানীর কথায়।

রাজা অপেক্ষা করেন কবে দুয়োরানীর ছেলে হবে। একদিন বানরছানা গিয়ে রাজাকে খবর দিলে যে, রাজ-চক্রবর্তী ছেলে হয়েছে তাঁর, কিন্তু গণনা ক'রে দেখা গেছে বিয়ে না দিয়ে ছেলের মুখ দেখলে রাজার চোখ অন্ধ হবে।

বিয়ের আয়োজন হ'তে লাগল।

কিন্তু ছেলে কোথায়? আগাগোড়া বানরছানার কারসাজি। রাজাকে ছেলে হবার কথা ব'লে সে দুয়োরানীর দুঃখ দূর করেছে। দুয়োরানীর অভাব নেই কিছুর। কিন্তু ছেলের কথা ভেবে তিনি ভয়ে অস্থির। রাজা টের পেলে তো আর রক্ষা নেই।

"বানর এসে বল্‌লে—মা গো মা, ওঠ্, চেলীর জোড় আন্, মাথার টোপর আন্, ক্ষীরের ছেলে গ'ড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।"

রানীর চক্ষুস্থির! ক্ষীরের পুতুল দিয়ে রাজাকে ভোলাবে!

বানর বললে—"মা, তুই ভাবিস্‌নে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয়, তবে ষষ্ঠীদাস ষেঠের বাছা কোলে পাবি।"

ক্ষীরের পুতুল সাজিয়ে নিয়ে বানর গেল বিয়ে দিতে।

শেষে মিল্‌নসারে সে এক কাণ্ড। পড়তে গেলেও হাসি পায়, শুনলেও হাসি পায়। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে ষষ্ঠীঠাকরুনের সে কি কাণ্ড। সুযোগ পেয়ে তিনি ক্ষীরের পুতুলটাই খেয়ে ফেল্‌লেন। কিন্তু—"এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে বললে—ঠাকরুন, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও। চুরি ক'রে ক্ষীর খাওয়া, ধরা পড়েছ—দেশবিদেশে কলঙ্ক রটাব।"

ষষ্ঠীঠাকরুন পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। লোভে প'ড়ে এখন দেবমাহাত্ম্য যায় বুঝি।

"ঠাকরুন ভয় পেয়ে বললেন—আঃ মর্! এ মুখপোড়া বলে কি! সর্ সর্ আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে! বানর বললে—তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব—"

ষষ্ঠীঠাকরুন লজ্জায় মরে গেলেন। লজ্জা হবারই তো কথা।

শেষে বানরছানাকে বললেন—"ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা।"

অবন ঠাকুর বটতলায় ষষ্ঠীঠাকরুনের ছেলেদের যা রূপ দিয়েছেন সে অতি অপূর্ব। কথার গাঁথুনিতে সে দৃশ্য কেমন সুন্দর হ'য়ে উঠেছে শোনো—

"ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য—সেখানে কেবল ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেই দিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা; কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা···কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙাটুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর—" এমনি কত ছেলে কত মেয়ে তার ঠিকঠিকানা নেই।

বানরছানা তারপর কী করলে, তাই শুনতে শিশু ও কিশোর উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। এমনি কৌতূহলের জালে বোনা ব'লেই 'ক্ষীরের পুতুল' সবার এত ভালো লাগে। গল্পের সবটা যদি জানতে চাও তাহ'লে 'ক্ষীরের পুতুল' পড়বে। তোমাদের সেই কৌতূহল আগে থাকতে নষ্ট ক'রে দিতে চাইনে।

আর একখানি মজার বই 'ভূতপত্রীর দেশ'।

বাঙলার কিশোর-সাহিত্যে এই বইখানি অমূল্য সম্পদ। পড়তে আরম্ভ করলে আর কোনো দিকে জ্ঞান থাকে না। পাতার পর পাতায় লেখক আনছেন বিস্ময়, জাগিয়ে তুলছেন কৌতূহল। সেই সঙ্গে তার রূপ দিয়েছেন

তুলিতে। রেখায় লেখায় 'ভূতপত্রীর দেশ' অদ্ভুত বস্তু হয়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে ছড়া। তার তুলনা কোথায়?

"চলে চলে হুম্‌কি তালে
মাসি পিসি বাঘ বেড়ালে।
ভুঁত পেরেতে চল্‌ছে রেতে
হন্‌হনিয়ে ভুঁত পেরেতে।
পাল্কি দোলে উঠতি আলে।
ঝালকি হেঁলে নাম্‌তি খালে।
আলো-আঁধারে শেওড়া গাছ।
কালোয় সাদায় বেরাল নাচ।
মরা নদী বালির ঘাট
মনসা-তলায় মাছের হাট।
ভূতের জমি পুতের জমি
ভূত পেরেতের নাইক কমি।
উড়ছে কতক ভন্‌ভনিয়ে
চল্‌ছে কতক ছন্‌ছনিয়ে,
ঢুলছে কতক গাছতঁলাতে
ঢুঁলছে কতক তালপাতাতে।
দিন দুঁপুরে বাদুড় ঘুমোয়
রাত দুঁপুরে হুতোম ঘুমোয়।
ভোঁদড় ভাম বেঙ বেঙাচি
টিক্‌টিকি আর কালো মাচি।
গঙ্গাফড়িং জোনাক পোকা
আরসোলা আর নেঙটা খোকা।"

কত মজার কথা, কত হাসির ছবি, কত সুন্দর সুন্দর ছড়ায় ভরা এই 'ভূতপত্রীর দেশ'। ভূতুড়ে গল্প, তার ভাষাও মাঝে মাঝে হয়ে উঠেছে ভূতুড়ে—তাই হঠাৎ যেখানে-সেখানে চন্দ্রবিন্দুর আবির্ভাব।

এইখানেই অবনীন্দ্রনাথ সত্যিকারের শিল্পী। তাঁর ভাষায় তাঁর ভাব তাই সত্যিকারের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এ বিষয়ে তিনি ওস্তাদ কারিগর।

তাঁর লেখা 'রাজকাহিনী' যেদিন বেরুল, সেদিন কিশোর-মহলে প'ড়ে গেল কাড়াকাড়ি। একদিন তিনি শিশুদের জন্যে লিখেছিলেন 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল'। সেদিন শিশুদের তিনি জাগিয়েছিলেন রূপকথার সোনার কাঠিতে, দেখিয়েছিলেন বিস্ময়ের বিরাট রাজ্য। তাদের জন্যেই আবার লিখলেন রাজপুতানার অমর কাহিনী। এমন ক'রে রূপ দিলেন সেই শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী, হাম্বির, চণ্ড, কুম্ভের কাহিনীকে, যা পড়তে গিয়ে কিশোর-পাঠক দেখলে রাজপুতদের অসীম সাহস, তাদের বীরত্ব, তাদের দেশপ্রেম। কিশোর প্রাণেও তখন উঠল ঝঙ্কার, সে শিখলে দেশকে ভালোবাসতে, দেশকে রক্ষা করবার জন্যে সে-ও তখন কল্পনায় বিভোর হয়ে রইল। 'রাজকাহিনী'র ভাষাই এর মূলে।

দিল্লির পাঠান-বাদশা আলাউদ্দীন শুনেছিলেন পদ্মিনীর কথা। শুনেছিলেন যে, পদ্মিনীর মত সুন্দরী হিন্দুস্থানে নেই, তার রূপের মহিমায়, গুণের গরিমায় দেশ ছেয়ে গেছে। সবার মুখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বাণী—"চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী।" বাদশা আলাউদ্দীনের চোখ জ্ব'লে উঠল, তিনি লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ছুটলেন চিতোরের দিকে, পদ্মিনীকে বাহুবলে জয় ক'রে আনতে। অত্যাচারী বাদশা। তাঁর ভয়ে সবাই অস্থির। তাঁর ভয়ে উৎসব বন্ধ হয়ে যায়, আনন্দ থেমে যায়। অবন ঠাকুরের বর্ণন-ভঙ্গীতে সেই দৃশ্য ছবির মত ফুটে উঠেছে। তিনি লিখছেন—

"তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে দিকে আনন্দের রোল উঠেছে—'হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়!' ঘরে ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো-হো আর বাসন্তী-রঙের বাহার। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি-খেলার মাঝখানে, একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল আলাউদ্দীন আসছেন—ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিতোরের সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে নিবে গেল। তখন কোথায় রইল রাজার রাজ-সভায় ধ্রুপদ-খেয়ালে হোরি-বর্ণনা, কোথায় রইল রানীদের অন্দরে 'ফাগুনমে হোরি মচাও' ব'লে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে-লাল রাস্তায় দলে-দলে হাসি-তামাসা আর কোথায় বা গোপাল-জীর মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর।"

উৎসব-আনন্দ বন্ধ হ'লো। কিন্তু—

"আবিরে গোলাপে লালে-লাল চিতোরের ঘরে-ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনার সঙ্গে আর এক ভয়ঙ্কর খেলার আয়োজন চলতে লাগল—সে খেলা লোকের

প্রাণ নিয়ে খেলা—তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের গর্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ। শেষে একদিন পাঠান-বাদশার কালো নিশান শকুনির মতো মেবারের মরুভূমির উপর দেখা দিলে। ভীমসিংহ হুকুম দিলেন—'কেল্লার দরজা বন্ধ কর।' ঝন্ ঝন্ শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।"

ভীমসিংহ বুঝতে পেরেছিলেন আলাউদ্দীনের অভিপ্রায়। তাই চিতোরের ফটক বন্ধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের আশঙ্কার সূচনা হ'লো এইখানেই।

পদ্মিনীর এই কাহিনীতে পদ্মিনীর মহিমা একদিকে যেমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে কথাশিল্পীর বর্ণনাগুণে, অন্যদিকে তেমনি ভীমসিংহ, আলাউদ্দীন, গোরা, বাদল—সবার চরিত্র-ই রূপ পেয়েছে সার্থক ভাবে। সেই সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রে ভীমসিংহ ও আলাউদ্দীনের অশ্বপৃষ্ঠে রাজপথ দিয়ে চলার বর্ণনা, চিতোরেশ্বরী উবর দেবীর আকস্মিক 'ম্যয় ভুখা হুঁ' ব'লে আবির্ভাবের কথা—প্রত্যেকটির ভিতর দিয়ে সাহিত্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনা-শক্তির নিপুণতা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশের প্রতিটি লোক যদি দেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, দেশের জন্যে সব কিছু উৎসর্গ করে, তবে কি আর দেশ বিদেশীর হাতে যায়। দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেই যেন তিনি চিতোরেশ্বরীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"ম্যয় ভুখা হুঁ!—বড় ক্ষুধা, বড় পিপাসা, আমি মহাবলি চাই—রক্ত না হ'লে এ পিপাসার শান্তি নেই। মহারাজা! ওঠ, জাগো, দেশের জন্যে বুকের রক্তপাত কর—আমার খর্পর রক্তের শতধারায় পরিপূর্ণ কর। রাজা-প্রজা, বালক-বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে, তবেই কল্যাণ। না হ'লে, সূর্যবংশের রাজ-পরিবার আর কখনো চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না।"

হিন্দু-মুসলমানের অপূর্ব মিলনের কথা ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা 'বাপ্পাদিত্যে'র কাহিনীর শেষ-কয়েক লাইনে। বাপ্পা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রিয়। তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হ'ল। পূর্বদিকে—হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা; পশ্চিমে—ইরানীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর

পাঠানের দল ; হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের মতো কবর দিতে ব্যস্ত হ'ল। শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর একপিঠে আল্লার দোয়া-লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাদ্লার উপর থেকে খুলে নেওয়া হ'ল, তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না—কেবল রাশি রাশি পদ্মফুল আর গোলাপ ফুল। চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজীর মন্দিরে মানস-সরোবরের জলে রেখে দিলেন। ইরানী-বেগম একটি গোলাপ ফুল সখের গুল্‌বাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ-জলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন—"

এমনি সহজ-মধুর অপরূপ ভাষায় কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যে সব কাহিনীর রূপ দিয়েছেন, তারা যেন এক একখানি সুন্দর ছবি, যে-ছবি দেখতে ভালো লাগে, যে-ছবির বাণী প্রাণের তারে গিয়ে ঝঙ্কার তোলে, যে-ছবির তুলনা খুঁজতে গিয়ে আর ছবি মেলে না। বাঙলা-সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথ এই অননুকরণীয় ভাষার জন্যেই অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর ভাষায় আছে কবিতার ছন্দ, কোথাও কোনো জড়তা নেই, যেমন সরল ও সাবলীল তেমনি দৃঢ়। অবনীন্দ্রনাথের রচনা-শৈলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পথ ধ'রে চলেছে।

'টুকরী-বুড়ী' ছোট গল্প। তাঁর শেষবয়সের লেখা। তার ভাষার নমুনা দেখলে বুঝতে পারবে, তাঁর মুন্সিয়ানা কোথায়।—

"জ'ন্মেই শুরু করলেন ছেলেটি কান্না—উ, আঁ—ঙ, ঙ, ঙ, সে কান্না আর থামে না।

—ও ছেলের মা, দুধ দাও গো—ভুখ লেগেছে, ছেলে যে গেল।

দুধ টেনে খায় ছাওয়াল চোঁ চোঁ—পেট ভরে, তার পরেই আবার শুরু ঙ, ঙ। মা বলে—বুকে যে দুধ নেই বাবা, আর কি খাবা। বলে, গাই-দুধ কোথা পাবো, বাঘের দুধ আনি খাওয়াব ? ও ছাগলীর মা, যা তো বনে,—দেখ্‌ তো বাঘিনী বিয়ালো কনে ?" ... ...

তারপর—

"ছেলে বড় হয়। এখন আর কাঁদে না, ক্রন্দন করে। আরো বড় হয়ে তখন বিলাপ করে। পড়শীরা বলে—ও ছেলের মা, আর দেখ কি, এইবার প্রলাপ শুরু হ'লেই হ'ল। দিন থাকতে ছেলের বিয়েটি দিয়ে ওকে বউয়ের জিম্মে ক'রে তুমি ভেখ্‌ নিয়ে বেরিয়ে পড়—না হ'লে ভোগান্তি আছে কপালে।—তা, করলে কি, জুটিয়ে দিলে ছিঁচকাঁদুনে একটা মেয়ে পাড়ার

পাঁচজনে,—হয়ে গেল বিয়ে। ছেলের মা এক চোখে হাসে—এক চোখে কাঁদে, আর বলে—বৌ তুমি রইলে—পাড়ার পাঁচজনা তোমরা রইলে —আমি চল্লাম টুকরী হাতে পাড়া ছেড়ে।

—আমার ঘরও রইলো দুয়ারও রইলো—
বউও রইলো, বেটাও রইলো—
আমিই চল্লেম খালি
হয়ে বরানগর কাশীপুর হাবড়া শাল্‌কে বালি।"

'শকুন্তলা', 'ভূতপত্রীর-দেশ', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী' ছাড়াও তিনি ছোটদের জন্যে লিখেছেন—'নালক', 'পথে-বিপথে', 'বুড়ো-আংলা', 'খাতাঞ্চীর খাতা', 'মারুতির পুথি' প্রভৃতি আরো অনেক বই। আর বহু গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক তাঁর ছড়িয়ে আছে মাসিক কাগজের পাতায়। সে-সব জড়ো করলে আরো অনেকগুলি বই হবে তাঁর।

অবনীন্দ্রনাথ একজন বড় সঞ্চয়ী। তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্রতকথা শুনে শুনে সংগ্রহ করেছেন, সঞ্চয় করেছেন তাঁর 'বাংলার ব্রত' বইখানিতে।

তাঁর এই বইখানির ভিতর দিয়ে পরিচয় পাওয়া যায় বাঙলার প্রাচীন গৃহশিল্পের, পাল-পার্বণের আল্‌পনার নমুনা। ফরাসী দেশে নাকি বাঙলার এই আল্‌পনার বিশেষ প্রচার হয়েছে। তারা নাকি বাঙলার এই আল্‌পনার অনুকরণে পরদায়, চাদরে ছবি এঁকে ঘরের শ্রীসম্পাদন করছে।

'বাংলার-ব্রত' লোকশিক্ষার বই হিসেবে বিশেষ স্থান পাবে সন্দেহ নেই। এক সময় এই সব 'ভাদুলি-ব্রত', 'লক্ষ্মীব্রত', 'তোষলা ব্রত', 'হরিচরণ ব্রত', 'আদর-সিংহাসন-ব্রত', 'সাঁজ-পূজনী' বা 'সেঁজুতি-ব্রত' প্রভৃতির ভিতর দিয়ে বাঙলার মেয়েরা উৎসব-আনন্দে মেতেছে, সুন্দরের পূজা করেছে, মনের নানা আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছে অলক্ষ্য দেবতার কাছে।

দেবতার আবির্ভাব হবে বাড়ির আঙিনায়, তাই ঘরদোর সব পরিষ্কার হ'লো, গোবরের ছড়া পড়লো, আল্‌পনা আঁকা হ'লো। হয় তো কাঁচা হাতের অপটু রেখায় সেই আল্‌পনার জন্ম ; কিন্তু তা অবহেলার জিনিস নয়। এই সব আল্‌পনার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"হাতের লেখা চিঠিখানি আর ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র এ দু'য়ে যা প্রভেদ, ধ'রে চিত্র করা আর নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে আল্‌পনা দিয়ে যাওয়ায় ততখানি ভিন্নতা।"

অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, বাঙলার এই সব লুপ্তপ্রায় ব্রতকথা ও আল্পনাকে তিনি উদ্ধার করেছেন, এ-যুগের মেয়েদের সামনে তুলে ধরেছেন সেই সব ছবি। এজন্যে বাঙলার ব্রতানুরাগী শিল্পানুরাগী মেয়েমহল তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলবে না।

'তোষলা ব্রতে' মেয়েরা প্রার্থনা করছে—

"কোদাল-কাটা ধন পাব,
গোহাল-আলো গোরু পাব,
দরবার-আলো বেটা পাব,
সভা-আলো জামাই পাব,
সেঁঝ-আলো ঝি পাব,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব।
ঘর করব নগরে,
মরব গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর
স্বামী-পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।"

এই রকম সব ব্রতের ছড়ার ছড়াছড়ি এই 'বাংলার-ব্রতে'।

আল্পনা সম্বন্ধে তিনি সুন্দর ও সত্য কথাই বলেছেন। তাঁর মতে আল্পনাও একটা শিল্প, তারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। তিনি বলেছেন—"আল্পনার শিল্প হচ্ছে সমতলভিত্তিকে চিত্রণ, এবং যা আঁকছি, তার পরিষ্কার চেহারাটি দেওয়া। হাতা হাতার মত না হয়ে হাতের মত হ'লে চলে না ব্রতের কাজে। একটা জিনিসের ঠিক চেহারাটি দু'চার টানে আঁকা যে কতখানি ক্ষমতার কাজ, তা চিত্রকর মাত্রেই জানেন। একজন এম্-এ ক্লাসের ছাত্রকে তার হাতের কলমটা আঁকতে বললে সে মাথায় হাত দিয়ে বসবে, কিন্তু তারি হয়তো পাঁচবছরের ভগিনীটি এই আলপনার সব কথানা অনায়াসে এঁকে যাবে নির্ভুল—হাতা বেড়ি গহনা ফুলপাতা সবই।"

সাহিত্য-সৃষ্টির পথে অবনীন্দ্রনাথ আর একটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন—'কথিকা'। তাঁর 'কথিকা'-গুলি যেন এক একখানি মুখর চিত্রপট। টুক্রো

টুকরো কথা সৃষ্টি করেছে এক একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্ত। ভাষায় সুন্দর, ভঙ্গীতে সুন্দর, ভাবে সুন্দর। তিনি লিখছেন—

"ছবিওয়ালা কবিওয়ালা আর খবরওয়ালা তিনজনে পুজোর লেখারে এলো রাঁচিতে। উত্তরের বারাণ্ডায় তিনে মিলে কথাবার্তা চলে—ছবিতে কবিতে এবং পলিটিক্সের খবরে জড়াজড়ি। ছবি বলে—দেখ, দেখ। ধান ক্ষেতে সবুজ লেগেছে, দূর পাহাড়ে নীল আভা, আকাশে আলোর খেলা—তার মাঝে ঐ কালো মেয়ে। কবি বল্লেন—তুমি দেখ, আমি শুনি—বাতাস বলে যাই যাই, মেঘ বলে আসি আসি। ছবি বলে, দেখ দেখ জল চলে, দুলে চলে, বেঁকে চলে। কবি বলে, শোনো শোনো—পাখি কী বলে, মাঠে ঘাটে বাঁশি বাজে। ছবি বলে—কি সুন্দর কালো ঐ মেয়েটি। কবি বলে—নীল আকাশ কী মিঠে সুরই দিচ্ছে। খবরের কাগজ থেকে চোখ উঠিয়ে খবরী বলে—ওহে পড়ে দেখ খবরটা। কবি আর ছবির চমক ভেঙে যায়, খবরী পড়ে চলে বিশ্বের খবর, তর্কের ঝড় ওঠে চায়ের পেয়ালার উপর।"

চিত্রী, কবি, সাংবাদিক যাঁর যে কাজ তিনি তাই করে যাচ্ছেন। তারই বর্ণনা কেমন বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই কথাশিল্পীর রেখার টানে। তাই নয় কি?

বাঙলার প্রবন্ধ-সাহিত্যেও অবনীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বাগীশ্বরী-অধ্যাপক হিসেবে যে-সব বক্তৃতা দিয়ে গেছেন তা একদিকে যেমন ভারতীয়-শিল্পকলার রূপকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তেমনি ভাবের গাম্ভীর্যে, রচনার কৌশলে সত্যিকারের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তোমাদের কাছে এখন হয়তো 'বাগীশ্বরী-বক্তৃতাবলী' তেমন সহজ ব'লে মনে হবে না, কিন্তু বড় হয়ে যখন শিল্প ও সাহিত্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, তখন বুঝবে তাঁর এই বক্তৃতার মূল্য কতখানি।

তাঁর সেই বক্তৃতাবলী থেকে কিছু কিছু এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন—

"যোগ-সাধনা করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাসপ্রশ্বাস দমন ক'রে; কিন্তু শিল্প-সাধনার প্রকার অন্যপ্রকার—চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখির মতো মুক্তি দিতে হয়—কল্পনা-লোকে ও বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে।"

"Art-এর একটা লক্ষণ আড়ম্বরশূন্যতা—Simplicity। অনাবশ্যক রং-তুলি, কলকারখানা, দোয়াত-কলম, বাক্স-বাতি সে মোটেই সয় না। এক তুলি, এক কাগজ, একটু জল, একটি কাজল-লতা—এই আয়োজন করেই পূর্বের বড় বড় চিত্রকর অমর হয়ে গেলেন। কবির এর চেয়ে কমে চলে—কাগজ আর কলম; কিম্বা তাও নয়—একতারা কি বাঁশি, অথবা তাও বাদ, শুধু গলার সুর।"

... ...

"মৌচাক আর বোল্‌তার চাক—সমান কৌশলে আশ্চর্য ভাবে দুটোই গড়া। গড়নের জন্যে বোল্‌তায় আর মৌমাছিতে পার্থক্য করা হয় না, কিম্বা মৌমাছিকে মধুকরও নাম দেওয়া হয় না—অতি চমৎকার তার চাকটার জন্যে। মৌচাকের আদর তাতে মধু ধরা থাকে বলেই তো। তেমনি শিল্পী আর কারিগর দুয়েরই গড়া সামগ্রী, নিপুণতার হিসেবে কারিগরেরটা হয়তো বা বেশি চমৎকার হ'লো। কিন্তু রসিক দেখেন শুধু সে গড়নটা নয়, গড়নের মধ্যে রস ধরা পড়লো কি না। এই বিচারেই তাঁরা জয়মাল্য দেন শিল্পীকে, বাহবা দেন কারিগরকে।"

... ...

"আদিম শিল্পীর সামনে শুধু তো বিশ্বজোড়া এই রসভাণ্ডার খোলা ছিল, চেয়ারও ছিল না, টেবিলও ছিল না, ডিগ্রীও নয়, ডিপ্লোমাও নয়, এমন কি তার নিজের জাতীয়-শিল্পের Gallery পর্যন্ত নয়—কি উপায়ে তবে সে শিল্পকে অধিকার করলে? আমি অঙ্কন করছি, আমার নাতিটি পাশের ঘরে বসে অঙ্ক কস্‌ছে—এই ভাবে চল্‌ছে; হঠাৎ একদিন নাতি এসে বল্লেন—বেরাল না থাকলে তোমার মুস্কিল হ'তো, বেরালের রোঁয়ার তুলিও হ'তো না, তোমার ছবিও হ'তো না। তর্ক সুরু হ'লো। ঘোড়ার লেজ কেটে তুলি হ'তো। ঘোড়া যদি না থাকতো? পাখীর পালক ছিঁড়ে নিতেম। পাখী না পেলে? নিজের মাথার চুল ছিঁড়তেম। টাক প'ড়ে গেলে? নাতির গালে আঙুলের ডগার খোঁচা দিয়ে বল্লেম—দশটা আঙুলের এই একটা নিয়ে।"

বাগীশ্বরী-প্রবন্ধ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি প্রবন্ধের এক একটি বিশেষ মূল্য আছে। তিনি ছেলেদের অর্থাৎ ছোটদের চিরকালের বন্ধু। সেই সব কচি কাঁচা শিশু ও কিশোরকে যখন শাসনের বেড়াজালে বেঁধে রাখা দেখেন,

তখন তাঁর মন হাঁপিয়ে ওঠে। তারপর যখন দেখেন ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির আনন্দ ভুলে, বাইরের জগৎকে ছেড়ে ঘরে বসে আছে চুপটি করে, দিনরাত প'ড়ে আছে পুথিপত্রের স্তূপের নিচে, তিনি তখন তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, ওরকম প্রাণহীন হয়ে চললে ছোটরা বাঁচবে ক'দিন, চিরদিনের মত যে তারা অলস, অকর্মণ্য হয়ে পড়বে!

তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে সেই কথা বলেছেন—"গান করবে না, নৃত্য করবে না, ঘোড়ায় চড়বে না, কুস্তি করবে না, বাচ খেলবে না, সাঁতার কাটবে না, বাজনা বাজাবে না, কেবল পড়বে অন্ধকারে পিদুম জ্বালিয়ে, খেলার মধ্যে খেলবে পিং-পং—নয় তো মাঠে দাঁড়িয়ে ভিজবে, ফুটবল দেখবে, আর বক্তৃতা শুনে জয় অমুকের জয় ব'লে চেঁচাবে, এতে ক'রে বাঁচবে কতদিন? শরীর নষ্ট হচ্ছে, মন নষ্ট হচ্ছে, অকালে বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে……। আমরা ফতুর হয়েছি বাইরের উৎপাতে নয়, নিজেদের ভিতরের হাড়িডসার বুড়োগুলোর উৎপাতে; কেননা আমরা আমোদ করতে চাইলেও তারা চোখ রাঙিয়ে বলে খুব গম্ভীর ভাবে—স্মৃতি আর শ্রাদ্ধ-সভার ফর্দ ধ'রে—আমোদ কর, কিন্তু দেখো ছেলেমানুষি না হয়!…ডবল 'চ' দেওয়া 'চ্চেন' শিশুকাল থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে দেখি, স্থবিরেরাই আমাদের মানুষ কচ্চেন, খেলাচ্চেন, পড়াচ্চেন, পাশ করাচ্চেন, ছুটি ছুটি খেতে দিচ্চেন, বিয়ে দিচ্চেন, আমোদ করাচ্চেন, জেলে পাঠাচ্চেন।…এও একটা ভয়ঙ্কর 'চ্চেন'। এর মধ্যে থেকে মন-অশ্বটিকে বার ক'রে নিয়ে যাও; ছেড়ে দাও তাকে ইচ্ছাসুখে বিচরণ করতে, হে আমাদের স্থবিরের স্থবির সকল। তাকে করতে দাও প্রাণ খুলে 'চি'—বলুক তারা জোর গলায়—লিখচি, পড়চি, গাইচি, খেলচি। তাকে নিযুক্ত হওয়া থেকে ছুটি দিয়ে বিমুক্ত কর; রসগোল্লার রসে মাখানো চাবুকে পিঠ চুলকে দেওয়ার মানে কী তা সে বুঝে নিক একবার—।"

অভিনয়-শিল্পী

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ি এক সময় ছিল সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয়, সব রকম শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র। বাঙলাদেশে আধুনিক শিল্পকলার প্রচারে এই ঠাকুর-বাড়ি-ই অগ্রণী হয়ে রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে সেই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয়ের আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ। তাই বোধহয়, ভবিষ্যতে শিল্পকলার প্রায় প্রত্যেক দিকেই তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক-ই অভিনয় হ'তো সেকালকার ঠাকুরবাড়িতে। সে-সব নাটকের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বলেন সে-রকম নাটক আর হয় না। তার প্রধান কারণ ছিল, রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিষয় থাকতো সাধারণ-নাটক থেকে ভিন্ন ধরনের, তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা যাঁরা তাতে অভিনয় করতেন তাঁদের প্রত্যেকের অভিনয় হ'তো নিখুঁত, পাকা-অভিনেতার মত। আর, থাকতো অভিনয়-মঞ্চের অপূর্ব দৃশ্য-সজ্জা।

ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা মিলে একটা ড্রামাটিক-ক্লাব তৈরি করেছিলেন এক-সময়। অবনীন্দ্রনাথ-ই ছিলেন তার মধ্যে একজন বড় রকমের উদ্যোক্তা আর উৎসাহী সভ্য। সেই ক্লাবে একবার ঠিক হ'লো রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট'-থেকে তাঁরা একটা নাটক খাড়া করবেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' নাটকে রূপান্তরিত হচ্ছে। তিনি তখন নিজের হাতে নিলেন নাটক-তৈরির ভার। সেই নাটকই হ'লো—'বিসর্জন'।

অবনীন্দ্রনাথ হাসির-ভূমিকা অভিনয় করতেই বেশি ভালোবাসতেন। সে-সব ভূমিকায় তিনি যা অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনটি আর কেউ করতে পারেনি এ পর্যন্ত। এম্‌নি ছিল তাঁর অভিনয়ের প্রতিভা।

একবার তাঁকে এক ঘরোয়া-বৈঠকে প্রশ্ন করা হ'লো—"আচ্ছা, কার কাছ থেকে আপনি অভিনয় করা শিখতেন?"

প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—

—"ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে গান-বাজনা, অভিনয় তো লেগেই থাকতো, সেখানে আবার শিখবো কি? গান শুনে অমনি গানের সুর তুলে নিতুম। ঠিক হ'তো কি না বলতে পারি না। অভিনয়-ও সব দেখে দেখে শিখেছি, কেউ শিখিয়ে দেয়নি।...আমি চিরকালই কমিক-পার্ট করতে ভালোবাসতুম, রাজাগজার পার্ট করিনি কোনদিন।"

'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটকে অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সে অভিনয়ের কথা ভুলবেন না কোনদিন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় তিনি সেজেছিলেন তিনকড়ি। যেমন অপূর্ব হয়েছিল সে অভিনয়, তেমনি অদ্ভুত তাঁর রূপসজ্জা। বেশভূষার দিক থেকে অভিনয়ের চরিত্র যাতে নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে সে-দিকে তাঁর নজর ছিল তীক্ষ্ণ। ছেঁড়া শার্টের ওপর পানের পিক লাগিয়ে তিনি যখন তিনকড়ি-রূপে মঞ্চে দেখা দিলেন, তখন সবাই অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। তাঁর সেই অদ্ভুত সাজ দেখে তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন—"তুই অমন একটা হতভাগা-বেশ কোথায় পেলি বল্ তো?"

এই 'তিনকড়ি'র প্রসঙ্গে এক-জায়গায় তিনি বলেছেন—"রবিকা যে, বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনকড়ির মুখ দিয়ে আমাকে বলিয়েছিলেন 'জ'ন্মে অবধি আমার জন্যেও কেউ ভাবেনি, আমিও কারো জন্যে ভাবতে শিখিনি', এই হচ্ছে আমার সত্যিকারের রূপ। রবিকা আমাকে ঠিক ধরেছিলেন। তাই তো তিনকড়ির পার্ট অমন আশ্চর্য রকম মিলে গিয়েছিল আমার চরিত্রের সঙ্গে। ওসব জিনিস অ্যাকটিং ক'রে হয় না। করুক তো আর কেউ তিনকড়ির পার্ট, আমার মতো হবে না। ওই তিনকড়িই হচ্ছে আমার আসল রূপ।"

'ফাল্গুনী'-নাটকে তিনি হয়েছিলেন শ্রুতিভূষণ। হাতে বাঁকা লাঠি, বগলে ছাতা, গায়ে নামাবলী, পায়ে ঠন্‌ঠনে চটি—তাঁর সেই 'শ্রুতিভূষণে'র ছবি প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় সাময়িক-কাগজে। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তাঁর বড় দু'ভাই গগনেন্দ্রনাথ আর সমরেন্দ্রনাথ। প্রত্যেকের অভিনয় হয়েছিল সুন্দর ও নিখুঁত। আর, অবনীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, তাঁর চলায়, বলায়, রূপ-সজ্জায় প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল প'ড়ে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ছেলেরা প্রায়ই অভিনয় ক'রে থাকে—তাদের কোনো উৎসবে বা পর্বের দিনে। তোমরাও হয় তো অভিনয় ক'রে থাকবে। এই 'ডাকঘরে'-র মোড়ল সেজেছিলেন অবন-ঠাকুর। সে-রকম মোড়লি-

পার্ট আর কেউ করতে পারেনি আজ-পর্যন্ত। মোড়লের সেই বাঁকা-বাঁকা কথা, অবিশ্বাসের বিদ্রূপের হাসি, তাঁর অভিনয়ে চমৎকার ফুটেছিল।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যেবারে মিসেস এ্যানি বেসান্টের সভানেতৃত্বে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেসের অধিবেশন বসে, সেবারই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' অভিনয়ের আয়োজন করেন। রাজনৈতিক নেতাদের সামনে সেই অভিনয় হয়। মিসেস বেসান্ট সেই অভিনয় দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। সকলেই একবাক্যে বলেন—'এমন অভিনয় যে হ'তে পারে, এ ছিল কল্পনার বাইরে।' শেষদৃশ্যে সবার চোখেই জল এসে গিয়েছিল।

ডাকঘরের সেই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে সেই নাটকের যে অপরূপ মঞ্চসজ্জা হয়েছিল, তার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে অবনীন্দ্রনাথের একটা ঝোঁক ছিল। গুরুগম্ভীর পার্ট তিনি এড়িয়ে চলতেন সব সময়। নিজে প্রাণখোলা আমুদে মানুষ, তাই বোধ হয় হাসির পার্ট তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত। অল্প বয়সে একবার তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'অলীকবাবু' নাটকে 'ব্রজদুর্লভ' সেজে যা অভিনয় করেছিলেন, তা দেখে সবাই সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে, ভবিষ্যতে অবনীন্দ্রনাথ একজন সুদক্ষ অভিনেতা হ'তে পারবেন। তিনি হয়েও ছিলেন তাই।

বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশ ঘোষ একবার তাঁর তিনকড়ির পার্ট দেখে বলেছিলেন "এ রকম সব অ্যাকটর যদি আমার হাতে পেতুম, তবে আগুন ছুটিয়ে দিতে পারতুম।"

শুধু অভিনয় নয়, অভিনয়-সংক্রান্ত প্রায় সব দিকেই ছিল তাঁর দক্ষতা। রঙ্গমঞ্চের আধুনিক রূপসৃষ্টি তাঁর কল্পনা থেকেই একদিন দেখা দিয়েছিল। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দোষত্রুটির কথা তিনি বলেছেন বহু লোককে, চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছেন সব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার লেডী ল্যান্সডাউনকে অভ্যর্থনা করেন। সেই উপলক্ষে 'বাল্মীকির প্রতিভা' নাটকের অভিনয় হয়। অবনীন্দ্রনাথের উপর ভার পড়েছিল রঙ্গমঞ্চ তৈরি করবার, সেই সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করবারও। অবনীন্দ্রনাথের সেই হয়েছিল রঙ্গমঞ্চ-সজ্জার হাতেখড়ি। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনায় অভিনেতাদের সাজসজ্জা থেকে আরম্ভ ক'রে দৃশ্যপট পর্যন্ত সব-কিছুতে তাঁর মুন্সিয়ানাই ফুটে উঠেছিল সেদিন।

অভিনয়ের দিক থেকে অবনীন্দ্রনাথের যেমন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, বাজনার দিক থেকেও তেমনি তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে আমরা অবাক হয়ে যাই। ভাবি, একটা মানুষের মধ্যে এত কৃতিত্ব এলো কেমন ক'রে।

এস্‌রাজ বাজাতে অবনীন্দ্রনাথ একদিন ছিলেন ওস্তাদ। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তিনি প্রায়ই এস্‌রাজে সঙ্গৎ করতেন। যাঁরা তাঁর এস্‌রাজ বাজানো শুনেছেন, তাঁরা বলেন—অবন-ঠাকুর পাকা বাজিয়ে। সে-কথা মোটেই বাড়িয়ে বলা নয়, খাঁটি সত্যি। রবীন্দ্রনাথ যখন নতুন নতুন গানের নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করতেন, অবনীন্দ্রনাথ তখন সেই নতুন সুর ধরতেন তাঁর এস্‌রাজে।

চিত্রে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে তাঁর এই অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে শুধু একটি কথাই বল্‌তে ইচ্ছে হয় যে,—অবনীন্দ্রনাথ হ'লেন সত্যিকারের জাত-শিল্পী।

কারিগর

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সেও শিল্পচর্চা ত্যাগ করেন নি। এখনো সময় সময় রঙ, তুলি, কাগজপত্র নিয়ে বসেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময় তিনি এখন পুতুল-খেলায় ব্যস্ত!

তোমরা ভাবছ, অবন-ঠাকুর পুতুল খেলেন, সে আবার কি! কিন্তু সত্যিই তিনি পুতুল নিয়ে খেলেন,—শুধু খেলেন না, পুতুল তিনি তৈরি করেন।

পথ চল্‌তে পেলেন এক টুকরো কাঠ, একটা বাঁশের গাঁট, কি একটা নারকোলের মালা, কি সুপুরিগাছের খোলা—এই সব তিনি কুড়িয়ে এনে জড়ো করলেন তাঁর ঘরে। তারপর তাই থেকে তৈরি হ'লো—চিল, বাঘ, কুকুর, হরিণ, কুটির, দুধওয়ালী, হজ-ফেরৎ উট, চরণিক, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত!

অবনীন্দ্রনাথ এইসব খেলনা বা পুতুলের কী নাম দিয়েছেন জানো? তিনি এগুলোকে বলেন—'কুটুম-কাটাম'।

'কুটুম-কাটাম' ছোটদের চোখে ছেলেখেলা হ'লেও, শিল্পীর চোখে তা অপূর্ব সৃষ্টি।

ছুতোর-মিস্ত্রী করাত দিয়ে কাঠ চিরে, হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে কাঠ কুঁদে খেলনা বা পুতুল গড়ে। সে কাঠ থেকে নতুন একটা জিনিস তৈরি করে। তার সৃষ্টি হ'লো তার নিজের।

অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু খেলনা গড়েন কাঠ চিরে বা কুঁদে নয়, তিনি দেখে বেড়ান কোন্ গাছের গুঁড়িটা কুকুরের মুখের মত, কোন্ বাঁশের গাঁটটা দিয়ে সারসের ঠোঁট হবে,—তারপর সেই গাছের গুঁড়ি, বাঁশের গাঁটটা সংগ্রহ ক'রে এনে, একটা-কিছুর ওপর তাদের বসিয়ে তৈরি করেন কুকুর বা সারস। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, মেঘের মধ্যে অনেক সময় জীবজন্তু, পাহাড়পর্বত, মানুষ-এর ছবি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি রূপ ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির বাগানে,—গাছের ডালে, পাথরে, নুড়িতে, কত কিছুর মধ্যে। আমরা যখন পথ চলি, কি বনের ভিতর দিয়ে হাঁটি, তখন সেদিকে নজর দিই না, কিন্তু শিল্পীর চোখ তা এড়ায় না, অবনীন্দ্রনাথ সেই সব সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসেন নিজের খেলাঘরে।

সেখানে গেলেই দেখা যাবে, তিনি ব'সে আছেন চেয়ারে। সামনেই একটা কাঠের টেবিল। তার ওপর যত রাজ্যের কাঠকুটো। ছোট্ট একটা করাত, ছুরি, লোহার কাঁটা, ছোট্ট হাতুড়-বাটালিও রয়েছে সেখানে। কোনো কিছু জোড়াতাড়া দেবার সময় এই সবের দরকার।

'রাজা'-র মুকুট চাই,—তার জন্যে আছে সিগারেটের রাঙতা; 'মেয়ে'-র খোঁপায় দিতে হবে ফুল,—তার জন্যে আছে রাখীবন্ধনের রাঙা-সূতোর ফুল; 'বিয়ের কনে'-র নাকে হয়তো নোলক পরাতে হবে,—তার জন্যে আছে কাচের পুঁতি। সংগ্রহের আর অন্ত নেই। এক টুকরো দড়ি, সেলুলয়েডের ভাঙা পুতুলের টুকরো, পিরিচের একটা অংশ, টিনের ছোট্ট বাক্স, নারকোলের মালা, পায়রার পালক, কাচের চুড়ি—কত কি।

তিন-চার টুকরো লোহার ছোট্ট পাত দিয়ে তৈরি হ'লো—'সৈনিক'। মাথায় লোহার টুপি। টেবিলের ওপরে ব'সে আছে। কেউ কেউ বলে—'এ-আর-পি'।

আমগাছের একটা মোটা ডালের অংশ ভেঙে পড়লো মাটিতে। অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন, সেটা দেখতে বেশ বড় রকমের একটা পাখি। নিয়ে এলেন মাটি থেকে তুলে। তারপর গাছের কয়েকটা ডাল দিয়ে তৈরি করলেন

একটা স্ট্যাণ্ড। তার এককোণে বসিয়ে দিলেন সেই মোটা ডালের অংশটিকে। পেছন ফিরে সে ব'সে রইলো। তাকে দূর থেকে দেখলে সত্যি মনে হবে একটা 'চিল' যেন কোত্থেকে উড়ে এসে গাছের ডালের ওপর পেছন ফিরে বসেছে।

কতকগুলো কাঠের টুকরো, গাছের গুঁড়ি আর দড়িদড়া দিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'হজফেরৎ উট'। গাছের গুঁড়িটা সত্যি ভারি অদ্ভুত ধরনের। চারটে সরু ডাল বেরিয়েছে তা থেকে, আর একটা-দিক ছুঁচলো হয়ে গেছে। ঐ চারটে ডাল হ'লো উটের পা, আর ছুঁচলো দিকটা ঠিক যেন উটের মুখ! কিন্তু শুধু উট হ'লে তো চলবে না, তার ওপর সওয়ার চাই। তাই কাঠের একটা লোক বসানো হ'লো তার ওপর। লোকটা নাকি হজ শেষ ক'রে উটে চ'ড়ে বাড়ি ফিরছে। সঙ্গে বাক্স-পেঁটরা, উটের দু'দিক দিয়ে ঝোলানো। ভারি সুন্দর এই 'কুটুম-কাটাম'টি।

কাঠের ঐ রকম একটা গুঁড়ি থেকেই অবনীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন 'শুক পক্ষী'। ঐ রকম একটা গাছের ডালের ওপর বসিয়ে দিলেন তাকে। গুঁড়িটা দেখলে মনে হবে না যে, ওটা পাখি নয় বা অন্য কিছু। চোখ ছিল না। চোখ না থাকলে অঙ্গহানি হয়। তাই তুলি দিয়ে এঁকে দিলেন তার চোখ। আর কিছু কাটাকুটি বা চেরাচিরি করলেন না তার ওপর।

একবার তিনি এই লেখকের ছোটবোন যূথিকা-কে উপহার দিলেন একটা 'সারস-পাখি'। আমের তিনটি সরু ডাল দিয়ে তার সৃষ্টি। তার একটি হচ্ছে পাখির লম্বা ঠোঁট, একটি তার দেহ, আর একটি তার পা।

প্রশ্ন করা হ'লো—"পাখির আর একটা পা কই?"

—"কেন, ঐ তো, ছোট্ট দড়িটা ঝুলচে!"

দেখা গেল পাখির দেহ আর পা যেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা, সেখানটায় ছোট্ট পাটের দড়ি একটু নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বল্লেন —"দেখনি, জলের ধারে সারস যখন মাছের লোভে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তার একটা পা থাকে মাটিতে, আর একটা পা লুকিয়ে থাকে পেটের তলায়? আমার সারস-পাখির একটা পা তো দেখছই, আর ঐ দড়িটা তার সেই লুকোনো পা।'

দেখা গেল, সত্যি, তাই তো।

শিল্পীর চোখ। চারিদিক তার নজরে পড়ছে। তাই, কোনো কিছুই

এড়াবার উপায় নেই। সারস-পাখি মাছ ধরবার সময় এক পায়ে কেমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে তিনি সেটুকুর পর্যন্ত রূপ দিয়েছেন তাঁর 'কুটুম-কাটামে'।

কুকুর-এর ছবি তিনি একদিন খুঁজে পেলেন একটা বড় কাঠের গুঁড়িতে। অমনি লোক দিয়ে সেটাকে নিয়ে এলেন ঘরের বারেন্দায়। বসিয়ে দিলেন সেটাকে এক কোণে। গুঁড়িটা দেখতে এ-রকম যে, একটু বাদেই বুঝি কুকুরটা চেঁচাবে। কুকুর, হোক না সে কাঠের জড় পদার্থ, তবু কুকুর তো। কাজেই তাকে ও-রকম ছেড়ে রাখা ঠিক হবে না। তাই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রহের ভাণ্ডার থেকে নিয়ে এলেন একটা পুরোনো লোহার চেন। 'কুটুম-কাটাম'-কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন সেটাকে।

বাঁশের গাঁঠ থেকে তৈরি হ'লো—"স্ট্যাম্প কলেক্টর"। একটা ছোট্ট বাঁশের গাঁঠ। দেখতে একটা পাখির লম্বা ঠোঁট। অনেকটা মাছ-রাঙা-জাতীয়। অবনীন্দ্রনাথ ছুরি দিয়ে তার ঠোঁটটাকে ফাঁক ক'রে দিলেন একটু। তার মধ্যে পুরে দিলেন ডাকটিকিট। দেখা গেল, পাখি তার ঠোঁটে 'স্ট্যাম্প' জড়ো করছে। ভারি মজার, নয় কি? এই বাঁশের গাঁঠ দিয়ে তিনি বেড়াল, শামুক, ইঁদুর প্রভৃতি অনেক 'কুটুম-কাটাম' তৈরি করেছেন।

'কুটুম-কাটাম' যে শুধু খেলনা নয়, অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টি, তার অনেক পরিচয় আমরা তাঁর অনেক কুটুম-কাটামের মধ্যেই পেয়েছি।

মরুভূমিতে বালুর স্তর তোমরা হয়তো দেখনি, কিন্তু ছবিতে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। নদীর ঢেউয়ের মত সেই বালুর স্তর ঢেউ তুলে ছড়িয়ে থাকে বালুর সমুদ্রে। অবনীন্দ্রনাথ একবার একটা গাছের ছোট এক টুকরো বাকল পেলেন সেই রকম। দেখে মনে হয় যেন বালুকাময় মরুভূমি। সযত্নে তুলে রাখলেন সেটিকে। তারপর আর একদিন জুটে গেল এক টুকরো গাছের ডাল। খুব ছোট্ট। কিন্তু দেখতে ঠিক ছোট্ট একটা হরিণ। হরিণের মত শিঙ, মুখ, সব কিছু। তখন শিল্পী কী করলেন জানো? আগেকার সেই গাছের বাকল নিয়ে এসে এই হরিণকে বসিয়ে দিলেন তার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব এক ছবি ফুটে উঠলো তা থেকে। দেখলে মনে হবে বালুকাময় মরুভূমির ওপর দিয়ে সঙ্গীহারা এক হরিণ-শিশু ছুটে চলেছে প্রাণপণে। প্রকৃতির দানকে এ-রকম ক'রে রূপ দেওয়া তো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। শিল্প-স্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ এইজন্যই তো সাধারণ মানুষের মত হয়েও অসাধারণ।

শুকনো মাধবীলতার থেকে তৈরি হ'লো ফণা-তোলা 'গোখরো-সাপ'। অন্ধকার রাত্রে আচমকা দেখলে সেই মাধবীলতার সাপকে সত্যিকারের সাপ ব'লেই মনে হবে। ভয় পাওয়াও আশ্চর্য নয়!

'বুড়ী চরকায় সুতো কাটছে'—এরই রূপ দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ কাঠ-কুটো, লতাপাতা, নারকোলের মালা দিয়ে। ভারি সুন্দর দেখতে এই 'কুটুম-কাটাম'-টি।

এমনি ক'রেই তৈরি হ'লো—'শেয়াল-পণ্ডিত'! পণ্ডিত-মানুষ, হোক না সে শেয়াল। তার গায়ে একটা কোট না থাকলে কেমন দেখায়। ছাত্রেরা বলবে কি? এখন, কোট পাওয়া যায় কোথায়? অবন-ঠাকুর শেয়াল-পণ্ডিতের কোট খুঁজতে বেরুলেন। জুটেও গেল পথের মাঝে—সুপুরির খোলা। সেটাকে কেটে নিয়ে তিনি পণ্ডিতের গায়ের কোট বানিয়ে দিলেন। কাঠের 'শেয়াল-পণ্ডিত' তখন সুপুরি-গাছের কোট গায়ে দিয়ে হাত তুলে বক্তৃতা শুরু করল।

'গল্‌দা-চিঙড়ী' তৈরি হ'লো বাঁশের গাঁঠ থেকে। উপুড় হয়ে ব'সে সে নাকি তার গোঁফ উপরে তুলে তানপুরো বাজাচ্ছে। ভারি মজার!

আখরোটের খোলা, আমের আঁটি, তালের আঁটি—এই সব ফেলে-দেওয়া জিনিস থেকে অবন-ঠাকুর তৈরি করলেন কুটুম-কাটাম—'বৃন্দাবন'। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমনও রূপ পেলে একটি শুকনো বেঁটে তেঁতুল গাছ থেকে।

শুধু কি তাই? রামায়ণের ছবিও রূপ পেল এর মধ্য দিয়ে। কাঠের কৌশল্যা বসে আছেন। সামনে তাঁর দু-পাটি আমের আঁটির জুতো—রামচন্দ্রের। কবে রামচন্দ্র ফিরে আসবেন বনবাস থেকে, কৌশল্যা বসে বসে তারই দিন গুনছেন।

পাথরের 'প্রজাপতি', 'চাঁদের মেয়ে', কাঠের 'ঝিঁ-ঝিঁ পোকা', 'ফড়িং', 'মাছরাঙা', 'অসট্রিচ', 'আমসী বুড়ী', 'গলায়-দড়ি ভূত' আরও কত কী যে তিনি এমনি ভাবে গ'ড়ে তুলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শিল্পী-জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি এমনি ক'রে এই পুতুলখেলার কাজ নিয়ে আত্মহারা হ'য়ে আছেন।

'কুটুম-কাটাম'-এর প্রতি অবনীন্দ্রনাথের ভালোবাসার অন্ত নেই। তারা যেন তাঁর কত আপনার জন। তাদের কাউকে হারিয়ে ফেললে তাঁর দুঃখের শেষ থাকে না। নিজের ছেলে হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন ব্যাকুল হ'য়ে

ছুটোছুটি করে তিনিও তেমনি ব্যস্ত হন। এই প্রসঙ্গে স্বলেখিকা শ্রীপুণ্যা রানী চন্দ একটি গল্প লিখেছেন। শোন—

"অবনীন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। দৌড়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালুম। অনেক সিঁড়ি পর্যন্ত উঠেছেন। ডান হাতে লাঠি-গাছটি, বাঁ হাতে না-জ্বালানো সিগারটি দু'আঙুলে চেপে অন্য আঙুলগুলি দিয়ে হাঁটুর লুঙ্গিটা টেনে তুলে ধ'রে, মুখ নিচু ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে খটখট্‌ ক'রে উপরে উঠতে উঠতে ব'লে চলেছেন—না, এ কখনো চুরি নয়, এ একেবারে ডাকাতি—ডাকাতি করেছে।

"হ'ল কি? ঘাবড়ে গেলুম। কি আর করি, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি উপরে উঠে এলেন। প্রণাম ক'রে উঠতে তিনি বল্লেন—জানো, কাল আমার ওখানে ডাকাতি হয়ে গেছে—একেবারে ডাকাতি—সব লুটে নিয়ে গেছে।......

"চেয়ার একটা এগিয়ে এনে দিলুম। তিনি অত্যন্ত অস্থির মন নিয়েই বসে বল্লেন—কাল সন্ধ্যেবেলাও ঘরে যাবার সময় দেখে গেলুম সব ঠিক আছে। 'ভৈরবী'-কে ছোট আলমারিটার উপরে বসিয়ে রেখেছিলুম—সাঁঝের আলো তার মুখটিতে এসে পড়লো—মুখখানি যেন ভৈরবীর হাসিতে ভরে গেল।... ভৈরবীকে দেখে তো আমার মনটা ভারি খুশি—'লক্ষী-পেঁচা'কেও বল্লুম—তাহ'লে তুমিও থাকো এইখানে। ওদিকে 'মুকুট মাথায় সিংহ'-টা ডেকে উঠলো। বল্লে—আমি বুঝি তবে একলাটি এই কোণে প'ড়ে থাকব? বল্লুম—দরকার নেই বাপু, তুমিও এসো এইখানে—ব'লে সবক'টিকেই আলমারির উপরে এনে বসিয়ে দিলুম।......মনটা বড় খুশিতে ছিল কাল—রাত্রে ঘুমটাও ভালো হ'ল। সকালে আজ একটু অন্ধকার থাকতেই উঠেছি। বারান্দায় এলুম আমার কুটুম-কাটামদের খোঁজ নিতে। দেখি তারা কেউ নেই সেখানে। এঁ্যা—কি হ'লো—বাদশা বীরুকে (অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই ছেলে—অবনীন্দ্রনাথের বড় আদরের নাতি) ডাকলুম—বল্লুম—তোরা কেউ নিয়েছিস? তারা বল্লে—না। বৌমাদের বলি—তোমরা দেখেছ কি কে নিল? তারাও বল্লে—না। চাকর-বাকরদের ধমক্-ধামক দিলুম—তারাও বল্লে—তারা কিছু জানে না। বাগানে নেমে গেলুম তাড়াতাড়ি, ছেলেদেরও নিয়ে গেলুম—বল্লুম, খুঁজে দেখ সবাই মিলে, কি জানি যদি কেউ ফেলে দিয়ে থাকে। নিজেও কত খুঁজলুম। কোনো নিশানা পেলুম না

তাঁদের। কি ক'রে পাব—ডাকাতি হয়ে গেছে—লুটে নিয়ে গেছে—একি আর পাব কখনো।......আহা, তোমাকেও যদি দিতুম, তবে থাকতো। বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।"

তারপর কি হ'লো জানো?

অবনীন্দ্রনাথ হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন না। সারাদিন ধ'রে বহু লোক লাগিয়ে সেই 'ভৈরবী', 'পেঁচা' আর 'সিংহে'র খোঁজ করালেন। অবশেষে বহু খোঁজাখুঁজির পর তেতলার চিলে-ছাদের ভাঙা কার্নিশের ওপর পাওয়া গেল 'সিংহ' আর 'ভৈরবী'-কে। আর, 'পেঁচা'টিকে উদ্ধার করা হ'লো নিচে বাগানের এক কোণায় ইটপাটকেলের আবর্জনার স্তূপে। বাঁদরের উপদ্রবে এই কাণ্ড ঘটেছিল সেদিন।

এই কুটুম-কাটাম তৈরি করবার সময় অবনীন্দ্রনাথের একাগ্রতা কি কম। কবি যেমন দরদ দিয়ে কবিতা লেখেন, শিল্পী যেমন একনিবিষ্ট হয়ে ছবি আঁকেন, কারিগর অবনীন্দ্রনাথ-ও তেমনি একাগ্রতা নিয়ে তৈরি করেন এই সব খেলনা। দিনরাত্তির ব'সে ব'সে ঠুক্ ঠুক্ করছেন, আর ইট, কাঠ, ডালপালা থেকে রূপ দিচ্ছেন এক একটি কল্পনার।

'ঘরোয়া'-তে এই প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"এক এক সময়ে ভাবি, আগে যে যত্ন নিয়ে ছবি আঁকতুম, এখন সেই যত্ন নিয়েই পুতুল গড়ছি, সাজাচ্ছি, তাকে বসাচ্ছি কত সাবধানে।...সেদিন আমার পুরোনো চাকরটা এসে বললে, বাবু, আপনি এ-সব ফেলে দিন। দিনরাত কাঠকুটো নিয়ে কী যে করেন, সবাই বলে আপনার ভীমরতি হয়েছে।' আমি বললুম, ভীমরতি নয়, বাহাত্তুরে বলতে পারিস, দুদিন বাদে তো তাই হবে। তাকে বোঝালুম, দেখ্, ছেলেবেলায় যখন প্রথম মায়ের কোলে এসেছিলুম তখন এই ইট কাঠ ঢেলা নিয়েই খেলেছি, আবার ঐ মায়ের কোলেই ফিরে যাবার বয়স হয়েছে কিনা, তাই আবার সেই ইট কাঠ ঢেলা নিয়েই খেলা করছি।"

ডালপালা দিয়ে তৈরি এক 'গণেশ'ও দেখলাম একদিন তাঁর 'গুপ্ত-নিবাসে'র বাড়িতে। সেটি দেখিয়ে বললেন—"সেদিন বেড়াতে বেড়াতে এই ডালগুলো পেয়ে গেলুম। এই দেখ গণেশের পেট, আর এই তার শুঁড়। আবার তিলকও আছে কপালে, দেখেছ তো? কেমন, হয়নি?"

—"সত্যি, খুব সুন্দর হয়েছে। আপনার চোখে এতও সব পড়ে।"

অবনীন্দ্রনাথ শুধু হেসে জবাব দিলেন—"বুড়ো হয়েছি ব'লে ভেবো না দৃষ্টি নেই। নজর আছে সবখানেই।"

আলাপচারী

শিল্প ও কাব্যের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের বিরাট প্রতিভার সামনে দাঁড়ালে আমরা ভুলে যাই তাঁরা-ও আমাদেরই মতো মানুষ। ভুলে যাই আমাদেরই মতো তাঁরা হাসেন, কথা বলেন, কাজ করেন। ভুলে যাই এই জন্যেই যে, তাঁদের সৃষ্টি এত বিরাট, যার আড়ালে আসল মানুষটি যায় চাপা প'ড়ে, আমাদের চোখে বড় হয়ে দেখা দেয় শিল্পী ও কবি। আমরা তাঁদের শিল্পী হিসেবে আলোচনা করি, কবি হিসেবে করি সমালোচনা। কিন্তু আসল-মানুষটির সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, যখন তাঁকে পাই ঘরোয়া ভাবে, তখন দেখি তাঁর এক নতুন রূপ। তাঁর সে রূপ হয়তো অনেক সময় আমাদের কাল্পনিক রূপের সঙ্গে মেলে না, অনেক সময় হয়তো নিরাশ হ'তে হয়। আবার, কল্পনার বেশিও দেখা দেয় অনেক ক্ষেত্রে।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা পরিচয় লাভ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন কাল্পনিক অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে আসল-মানুষ-অবনীন্দ্রনাথ অনেক বেশি সুন্দর। মানুষ হিসেবে এমন মানুষ চোখে খুব কম-ই পড়ে। আর এমন আলাপী-মানুষ তো দেখতেই পাওয়া যায় না।

অবনীন্দ্রনাথের মত এত বড় কথক এ-যুগে পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা। আজকালকার ছেলেরা তো বুড়োদের কাছে ঘেঁসেই না, আর ঘেঁসলেও বুড়োরাও তেমন আমোল দিতে চান না। গল্প বলা তো দূরের কথা।

কিন্তু আলাপচারী অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা আলাপ-আলোচনা করেছেন, একথা তাঁরা ভালো ক'রেই জানেন যে, একবার আলাপ করতে বসলে সেখান থেকে আর উঠে আসতে ইচ্ছে করে না। তিনিও ভুলে যান নিজের ক্লান্তি, ভুলে যান সময়ের কথা—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে শুধু গল্প-গুজবই ক'রে যান। কিন্তু কখনো বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে না তাঁর চোখে-মুখে। গল্প পেলে তিনি যেন আর কিছু চান না।

১৩৪৯ সালের ভাদ্র মাস।

'আনন্দমেলা'-র তরফ থেকে বন্ধু মৌমাছি যাচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে,—তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে। সেই সঙ্গে এই লেখককেও তিনি আহ্বান করলেন তাঁর সঙ্গী হ'তে। সেইবারেই শিল্পগুরুর সান্নিধ্য লাভ ক'রে ধন্য হই।

'গুপ্ত-নিবাস'-এর বাড়িটার নিচের বারান্দায় আমাদের বৈঠক বসল। কাঠের প্রকাণ্ড বড় টেবিল। তার একদিকে বসলেন অবনীন্দ্রনাথ, একদিকে মৌমাছি। আর বাকি দু'দিকটায় মৌমাছি-র এক দাদা—শ্রীযুত প্রভাত বসু, সুমিতেন্দ্রনাথ (বাদশা), অমিতেন্দ্রনাথ (বীরু) আর আমি। বারান্দার এক কোণে একটা চেয়ারে ব'সে ছিলেন অলকেন্দ্রনাথ,—অবনীন্দ্রনাথের বড় ছেলে।

মৌমাছি বল্লেন—"আমরা আপনার ছেলেবেলাকার গল্প শুনতে এসেছি আপনার মুখ থেকে। ছেলেবেলায়, আপনি কী করতে ভালোবাসতেন, কোন্ দিকে আপনার ঝোঁক ছিল সেই সব গল্প।"

মৃদু হেসে অবনীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—"সে সব কি আর এখন মনে আছে? বয়েস হচ্ছে, সব ভুলে যাচ্ছি। ছেলেবেলাকার গল্প 'বাল্যস্মৃতি' নামে আমার একটি লেখায় বেরিয়েছিল। তোমরা তা থেকে অনেক গল্প জানতে পারবে।"

মৌমাছি ছাড়বার পাত্র নয়। তিনি বললেন—"সে আমরা শুনছি না, আমরা আপনার মুখ থেকেই কিছু শুনতে চাই।"

ভয় হ'লো পাছে অবনীন্দ্রনাথ বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু বিরক্তির ভাব তো দেখলাম-ই না, বরং সস্নেহে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, কিছু যা মনে আছে তাই বলছি।" এই ব'লে তিনি তাঁর ছেলেবেলাকার বহু ঘটনা বলতে লাগলেন আমাদের সেই বৈঠকে। তার প্রায় সব গল্পই এই বইয়ের 'ছেলেবেলা' পরিচ্ছেদে তোমরা পাবে।

কথাপ্রসঙ্গে একবার তিনি বললেন—"জানো, ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে জামা-কাপড় পরবার বেশ একটা নিয়ম ছিল। সুন্দর একটা দামী কোট ছিল, সেটা পরতেন বড়দা। আমার কিন্তু সেটা পরতে ভারি সখ যেত। কিন্তু গায়ে লাগবে কেন? বড়দার ছোট হ'লে মেজদা পরতেন সেই কোট, তারপর এইভাবে তাঁর ছোট হ'য়ে গেলে একদিন আমার ভাগ্যেও এসে জুটত। সেই কোট প'রে কিন্তু ভারি আনন্দ পেতুম।"

গল্পে গল্পে অনেক বেলা হয়ে গেল। তিনি একবার বললেন—"চলো আমার বৈঠকখানায়। সেখানে গিয়ে একটু বসা যাক।" সবাই চললাম তাঁর সঙ্গে বাগানের মধ্যে দিয়ে। যেতে যেতে প্রশ্ন করা হ'লো—"আপনার বাগান করবার সখ ছিল ছেলেবেলায়?"

—"ওঃ, ছিল না আবার! গাছ লাগিয়ে পুকুর খুঁড়ে তাতে টিনের হাঁস ছেড়ে দিয়েছিলুম পর্যন্ত। বাবামশায়ের বাগানে তো আমাদের ঢোকবার হুকুম ছিল না। তাই আমরা ক'জনা মিলে নিজেদের একটা বাগান বানিয়েছিলুম। বাবামশায়ের দেখাদেখি ইঁটপাথর জড়ো করেছি, এখানে ওখানে ঘাসের চাপড়া বসিয়ে নকল পাহাড় পর্যন্ত তৈরি করেছি, নইলে বাগানের শোভা খুলবে কেন? মাটি খুঁড়ে একটা গামলা বসিয়ে দিয়ে তার মধ্যে জল ভরে দিলুম। তারপর ছাড়া হ'লো টিনের হাঁস, মাছ, নানারকম খেলনা। সেই হ'লো আমাদের গোলদিঘি। তোমাদের গোলদিঘির মতো নয়। এখন আর নিজের হাতে বাগান করতে পারি না, ওই বুড়ো মালীই এখন সব করে। চলো না ওর কাছে যাই।"

দেখলাম, বুড়ো এক মালী বাগানে কাজ করছে। আমরা তার কাছে যাবার তেমন কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলাম না দেখে অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"আজকালকার ছেলেদের কি হয়েছে জানো? তারা বুড়োমি করবে, কিন্তু বুড়োদের কাছে মোটে ঘেঁসবেই না। হাজার বছরের পুরোনো পুথি তারা ঘাঁটতে ভালোবাসে, প্রাচীন ছবি দেখবার জন্যে তাদের সে কি উৎসাহ, অথচ পুরোনো মানুষ দেখলেই তারা পালায়।" এই ব'লে তিনি হেসে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চললেন তাঁর বৈঠকখানায়।

বৈঠকখানাটা হচ্ছে মালীর থাকবার ছোট্ট একখানা ঘর। রেললাইনের ধারে, বাগানের এক প্রান্তে। অবনীন্দ্রনাথ সেখানে বসতে খুব ভালোবাসেন। মৌমাছি সেখানে একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করলেন। সেটি হচ্ছে একটা ঝাঁটা। একটু অদ্ভুত ধরনের।

অবনীন্দ্রনাথ সেটা দেখে বললেন—"ও আমার মস্ত কুটুম। বুড়ো ঝাড়ুদার। দেখ তো, ওর ডাণ্ডায় কি রয়েছে!" দেখা গেল ঝাঁটার ডাণ্ডায় একটা মানুষের মুখ খোদাই করা হয়েছে ছুরি দিয়ে। তিনি বললেন—"মুখ চোখ না থাকলে, ঝাঁট দেবে কি ক'রে?"

ভারি মজার কথা বললেন একবার। মৌমাছির ছোড়দা প্রভাতবাবু খানকয়েক ফটো তুললেন। অবনীন্দ্রনাথ ফটো তুলতে গিয়ে হেসে বললেন—

"ছোটবেলা থেকেই ফটো তোলবার সময় আমার একটা ভুল হয়ে যায়। বেশ ঠিক আছি, কিন্তু যেই ফটোগ্রাফার বলে—রেডি, ব্যস, অমনি মাথাটা গেল ন'ড়ে।" ব'লেই হাসতে লাগলেন।

এমনি আর একদিনের ঘরোয়া বৈঠকে অবনীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলাম তাঁর ছবি আঁকার কথা।

তিনি বলেছিলেন—"ছবি আঁকবার দিনগুলির কথা বেশ মনে পড়ে। বহু দুঃখ পেয়েছি সে-সময়। মনে মনে কত কি ভেবেছি, তার সবকিছুকে তো রূপ দিতে পারিনি। যে কল্পনা মনে উঁকি দিত, তার সবটুকু যখন ছবিতে দিতে পারলুম না, তখন যে মনের কি অবস্থা, সে বেদনা কে বুঝবে!…কৃষ্ণ-চরিত্র নিয়ে ছবি আঁকবার সময় পেয়েছিলুম সত্যিকারের আনন্দ। আত্মহারা হ'য়ে ছবি এঁকেছি সে-সময়। চোখ বুজলেই যেন সব দেখতে পেতুম। কাগজে হাত দিলেই ফস্ ফস্ ক'রে ছবি বেরোত। সে ভাব এখন আর আসে না।… আর একবার এসেছিল মা'র ছবি আঁকবার সময়। মা মারা গেছেন। তাঁর ছবি একখানাও ছিল না ঘরে। কি ক'রে তাঁকে আঁকা যায় একমনে ব'সে ব'সে ভাবছি, হঠাৎ চোখের সামনে স্পষ্ট যেন দেখতে পেলুম তাঁকে। একবার মাঝে মিলিয়ে গেলেন। তারপর আবার পেলুম মাকে চোখের সামনে। ভালো করে দেখলুম তাঁকে। তারপর এঁকে নিলুম কাগজের পাতায়। মা'র ছবির মতো এত ভালো মুখের ছবি আমি আর আঁকিনি। সত্যিকারের প্রেরণা এসেছিল কিনা সে-সময়।"

আর একদিনের কথা।

১৩৪৯ সালের ভাদ্র মাসের একটা রবিবারের ঘণ্টা কয়েক। অল্প সময়ের অল্প আলাপ, কিন্তু মনে থাকবে চিরদিন। সহজে তা ভোলবার নয়।

দুপুরের একটা ট্রেনে আমরা যাব বরানগরে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে যাবে ছোটবোন যূথিকা। বিশেষ ক'রে তার জন্যেই যাওয়া। অবনীন্দ্রনাথকে সে দেখেনি।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার আনন্দে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ভয়ে-ভয়ে এমন প্রশ্ন-ও করছিল—"আচ্ছা, আমার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন তো, দাদা? কি জানি অচেনা লোকের সঙ্গে যদি আলাপ না করেন?"

হেসে বললাম—"খুব করবেন। দেখনি তো তাঁকে। একবার দেখলেই বুঝতে পারবে তাঁর কাছে চেনা-অচেনার কোনো ভেদ নেই, সবার সঙ্গেই তাঁর সমান ভাব।"

আমার কাছে ভরসা পেয়ে বোনটি আমার আশ্বস্ত হ'লেন, সে তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

আমরা 'গুপ্তনিবাসে' হাজির হ'তেই বীরুবাবু নেমে এলেন ওপর থেকে। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন—"দাদামশাই এখনো ওঠেন নি। একটু বাদেই উঠবেন। আপনারা বসুন, বাবা আসছেন।"

অলকবাবু নেমে এলেন। অনেকদিন পরে দেখা। নানান্ কথা, নানান্ খবর ;—আলাপ আলোচনা চলল কিছুক্ষণ ধ'রে। আমাদের কথার মাঝখানেই আর দু'জন যাঁরা এলেন তাঁরা হ'লেন শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় আর তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা মিলাদা গঙ্গোপাধ্যায়। মোহনলাল অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র। তিনি সস্ত্রীক কলকাতায় থাকেন, ফি-রোববারে বরানগরে আসেন দাদামশাইকে দেখতে।

কিছুক্ষণ বাদে খবর এলো—অবনীন্দ্রনাথ ওপরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে গিয়ে বাঁ-দিকের বড় ঘরখানায় প্রবেশ করলাম। অবনীন্দ্রনাথ একখানা কৌচে ব'সে। হাতে বর্মা-চুরুট, পরনে পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি, পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি। এই তাঁর সাধারণ বেশ। একদম সাদাসিধে।

কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি ব'লে উঠলেন—"এই যে, এসো, এসো। শুনলুম তোমার বোনও নাকি এসেছে। কই, সে কোথায় ?

যুথিকা আমার পেছনেই ছিল। এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"আমাকে দেখতে এসেছ ? বেশ, বেশ। সময় থাকতেই এসেছ। কলকব্জাগুলো তো অনেক পুরোনো হয়েছে, কখন্ বিগড়ে যায় তার তো ঠিক নেই।—ব'সো।"

এই সময় ভারি একটা মজার ব্যাপার হ'লো।

আমার সঙ্গে একটা টিফিন-কেরিয়ার ছিল। সেদিকে অবনীন্দ্রনাথের চোখ পড়তেই তিনি ব'লে উঠলেন—"কি ব্যাপার! ওতে আবার কি এনেছ ?"

—"বিশেষ কিছু না।"

—"উঁহু, বেশ মনে হচ্ছে বিশেষ-কিছু।"

—"আপনার জন্যে সামান্য কিছু খাবার ক'রে এনেছে জুঁই।"

—"খাবার? বেশ, বেশ! তা কী এনেছ?"

—"তেমন কিছু নয়—এই, খাজা-গজা-সন্দেশ।"

—"খাজা-গজা-সন্দেশ? বাঃ! খাজা গজা সন্দেশ,—খেতে লাগে মজা বেশ।"

জবাব শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। এ থেকেই বুঝতে পারবে ঘরোয়া অবনীন্দ্রনাথ কত মজার মানুষ।

তিনি বীরুবাবুকে ডেকে বললেন—"ওরে বীরু, যা ওগুলো রেখে দিয়ে আয় ভালো ক'রে। বাদ্‌শা যেন টের না পায়। টের পেলেই দেবে সাবাড় ক'রে।

তারপর শুরু হ'লো গল্প-গুজব আলাপ-আলোচনা।

—"নতুন কী আঁকলেন আর?"

—"বিশেষ আর আঁকিনি। শরীর ভালো যাচ্ছে না। কিছুদিন হ'লো চণ্ডী-সিরিজের ছবিগুলো এঁকে শেষ করেছি। বীরু, নিয়ে আয়। দেখা এদের।"

ছবি এলো। জলরঙে আঁকা সুন্দর সব ছবি। চণ্ডীকাব্যের বিষয়বস্তুকে তুলির রেখায় অপূর্ব রূপ দিয়েছেন তিনি। প্রত্যেকটি ছবি দেখালেন। চণ্ডীকাব্যের কোন্‌খানা কিসের ছবি তাও বুঝিয়ে দিলেন এক এক ক'রে। একটি বাঘের ছবি দেখিয়ে বললেন—"দেখছ তো বাঘ! কালকেতুর তীর লেগে কেমন উল্টে পড়েছে।"

—"তীর কোথায়? আপনার তূলির খোঁচায় বলুন।"

শুনে তিনি হেসে বললেন—"তা নেহাৎ মন্দ বলনি।"

আলাপ-আলোচনার মধ্যে জুঁই একবার বায়না ধরলো তাঁর ছেলেবেলাকার গল্প শুনবে ব'লে। অবনীন্দ্রনাথও বললেন অনেক কাহিনী, ছেলেবেলাকার যত দুষ্টুমির গল্প। সে-সব গল্প 'ছেলেবেলা' পরিচ্ছেদেই তোমাদের শুনিয়েছি।

একবার বললেন—"জানো, বিশ্বেশ্বর ব'লে আমাদের এক চাকর ছিল। বাবা-মশায়ের ফরসি সাজিয়ে দিত। সারি সারি ফরসি সাজায়, আর সময়মতো তামাক বদলে দিয়ে যায়। এই ছিল তার আসল কাজ। এই বিশ্বেশ্বরই

আমাদের তামাক খাওয়া শিখিয়েছে। একটু বড় হয়েছি। মা'র কাছে গিয়ে বিশ্বেশ্বর বললে—'বাবুরা এবার বড় হয়েছেন, তামাক না খেলে কি চলে?' মা বললেন—'ওরা খেতে চায় তো খাওয়া।' তখন বিশ্বেশ্বরকে আর পায় কে। চাকরি পাকা হবার বন্দোবস্ত হ'লো। কারণ তামাক সাজানোই তার কাজ। বাবুরা যদি তামাক না খেতে শেখে, তাহ'লে তার চাকরি থাকে কি ক'রে? বিশ্বেশ্বর নানারকম ক'রে তামাক খাওয়ানো শেখায়। কি রকম ক'রে টানলে খক্ খক্ ক'রে কাসি হবে না, সে শিখিয়ে দেয়। হাতে-কলমে তামাক খাওয়ার বিদ্যে পাকা হয়েছিল সে সময়।"

কথায় কথায় ছেলেবেলাকার আর-একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করলেন। সে ভারি অদ্ভুত। ছেলেবেলায় কখন্ তাঁর জ্বর আসবে তিনি নাকি আগেই তা টের পেতেন। বললেন—

—"স্বপ্ন দেখতুম, মস্ত বড় একটা আগুনের গোলা ছাদ ফুঁড়ে নেমে আসছে আমার দিকে। মনে হ'তো, যেন আমার গায়েই এসে পড়বে। আমি তো ভয়ে অস্থির। গলা ছেড়ে চীৎকার করতে চাইতুম—কিন্তু গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরুত না। তারপর সেই আগুনের গোলাটা গায়ের কাছাকাছি এসেই আবার আস্তে আস্তে উপরে উঠে যেত। আগুনের আঁচ লেগে চমকে উঠতুম। ঘুম যেত ভেঙে। তাকিয়ে দেখি সকাল হয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই। গা কপাল গরম হয়ে উঠেছে। মাকে স্বপ্নের কথা বলতেই তিনি জবাব দিতেন—'তোর জ্বর আসবে রে অবু।' সত্যি সত্যি একটু বাদেই বেশ জ্বর আসত।"

এমনি ধারা কত কথা, কত আলাপই যে চলতে লাগল। বলবার ভঙ্গীটি তাঁর এত সুন্দর যে, কান পেতে শুনতেই হবে, অন্যদিকে মন দেবার কোনো উপায় থাকবে না। গল্পের রসে তিনি শ্রোতার প্রাণমন ভুলিয়ে দেন। বৈঠকী গল্পের জাদুকর তিনি।

ঘরে একবার পদ্মফুলের দিকে চোখ পড়তেই তিনি কী বললেন জানো? বললেন—"আমি ওই পদ্মের মুড়ি খাই। শুধু মুড়ি কি ভালো লাগে? তাই, মুড়িগুলো যাতে থাকে পদ্মের সেই নরম জিনিসটাও খেয়ে ফেলি। বেশ লাগে খেতে।"

আমরা তো অবাক। পদ্মের মুড়ি আমরাও খাই, কিন্তু ওই ছোবড়া! মোহনলাল বললেন—"তুমি ওই ছোবড়াগুলোও খেলে?" হেসে তিনি

জবাব দিলেন—"হ্যাঁ খেলুম। বে-শ লাগে। তরকারি ক'রে খাস্। মিলাদা দেবে একদিন রেঁধে। ডাঁটা খেতেও চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু পারলুম না। দাঁতে আর জোর নেই কিনা।"

ব'লেই হাসতে লাগলেন।

যূথিকার দিকে তাকিয়ে বললেন—"ছেলেবেলায় কত কাণ্ডই যে করেছি। একবার কি হয়েছে জানো? বাড়িতে ছিল কাঠির মতো সরু সরু পা একজোড়া ইটালিয়ান কুকুর। খুব ছোট্ট দেখতে। কুকুর দু'টো পাঁউরুটি খায়, ডিম খায়, বিস্কুট খায়। আর আমার জন্যে প'ড়ে থাকে কৌচের নিচে খালি ডিমের খোলাটা। লুকিয়ে সেটা চিবিয়ে খাই। কিন্তু খেতে গিয়ে ধরা প'ড়ে যাই। পিঠে পড়ে বেত। তারপর ডাক্তার আসেন নীলমাধববাবু। পরীক্ষা করেন নানাভাবে। সবাই ছি ছি করে আমার কাণ্ড দেখে। আমি বুঝতে পারি না সে-সময়, এতে ছি ছি করবার কি আছে। সামান্য একটা ডিমের খোলা। বাবামশায় হুকুম দেন আমাকে মংলুর কাছে পাঠিয়ে দিতে। মংলু মেথর। তার সঙ্গে থাকতে হবে। ভেবে লজ্জায় আধখানা হয়ে যাই। রাগ হয় সেই ইটালিয়ান কুকুর দু'টোর ওপর। ওদের জন্যেই তো আমার এই দুর্ভোগ। তারা যদি ডিমের খোলাটা ফেলে না দিয়ে খেয়ে নেয় তবেই তো গোল চুকে যায়!"

ভারি মজার গল্প! তাই না?

একখানা ইংরিজি বই ছিল তাঁর কাছে। চীনেদের রান্নার কথা ছিল তার মধ্যে। সেখানা দেখিয়ে বললেন—"চীনেদের রান্নার কথা পড়ছিলুম কাল। অসুখ হ'লে চীনেরা কি বলে জানো? আগে খাবার, পরে ওষুধ। আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টো। আগে ওষুধ, পরে খাবার। আরে, রোগীকে যদি না খাইয়ে উপোস করিয়েই রাখলে, তাহ'লে আর ওষুধ দিয়ে লাভ কি? এ বইটায় বেশ লিখেছে। এটা পড়লেই আমার ক্ষিদে পায়!"

হেসে উঠি তাঁর কথা শুনে। জুঁই বলে—"ওমা! তাই নাকি?"

তিনি বললেন—"হ্যাঁ, সত্যি কথা! তোমার যখন ক্ষিদে পাবে না, তখন নিয়ে যেয়ো আমার কাছ থেকে বইখানা, প'ড়ে দেখো আমার কথা সত্যি কিনা।"

এই কথা বলতে বলতেই ভিতর থেকে সবার জন্যে চা, জলখাবার এসে হাজির। তিনি বললেন—"দেখলে তো? বই পড়তে না পড়তেই একেবারে।

ওরে, আমার জন্যে নিয়ে আয় তো খাজা। খেয়ে দেখি কেমন লাগে। অনেকদিন খাজা খাই না। জোড়াসাঁকোয় আমাদের এক ঠাকুর খাজা ক'রে খাওয়াতো। সে অনেকদিন আগেকার কথা।"

খাজা খেয়ে তিনি খুব খুশি। বাদ্‌শাকে ডাকলেন। বাদ্‌শা আর সামনে এলো না। সবার সামনে তাকে অমন ক'রে বলাতে সে লজ্জা পেয়ে লুকিয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"খেলিনি, কিন্তু ঠকলি।" তারপর জুঁইকে বললেন—"বেশ হয়েছে। টাটকা টাটকা এনেছ, তাই একরকমের স্বাদ। বাসি ক'রে খেলে কিন্তু আরো ভালো লাগতো।"

জুঁই বললে—"সন্দেশটা একটু খান।"

—"আচ্ছা, দাও একটু ভেঙে। বেশি খাওয়া এখন বারণ। আর খাবার বয়সও তো নেই!"

সন্দেশের টুক্‌রো মুখে দিয়ে বললেন—"সন্দেশ খেয়েছিলুম নাটোরে। ওঃ, সে একদিন গিয়েছে! তখন আমরা তরুণ। নাটোরে গিয়েছি সভা করতে। মহারাজা ঘুরে ঘুরে সব দেখাশুনো করছেন। একদিন তাঁকে বললুম—'কি সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন নাটোর, আনতে আনতেই যে ঠাণ্ডা! গরম গরম সন্দেশ খাওয়াতে পারেন?' তখুনি হুকুম হ'য়ে গেল মহারাজার, হালুইকররা সব ব'সে গেল সন্দেশ তৈরি করতে। এক একজন ক'খানা ক'রে যে সন্দেশ খেয়েছি তার ঠিক নেই। খাইয়ে ব'লে সে-সময় একটা খ্যাতিও ছিল। তোমার সন্দেশও বেশ লাগছে। ঘরের তৈরি জিনিস, এর স্বাদই আলাদা!"

তারপর নানারকম খাবারের গল্প। কোন্ খাবারি কেমন ক'রে তৈরি করলে তার সুস্বাদ হয়, কিসে কোন্ উপকরণ কতটা দরকার, তারও লম্বা ফিরিস্তি শুনলাম তাঁর মুখে। একবার বললেন—"আজকালকার মেয়েরা তো রান্না ভুলতেই শুরু করেছে। তাদের হাতে খালি বই, খাতা, কাগজ, পেন্সিল। তার চাপেই তারা মারা পড়বার জোগাড়! কিন্তু রান্নাও যে বড়ো রকমের একটা আর্ট—তাকে ভুললে চল্‌বে কেন?"

কথায় কথায় যুদ্ধের কথা উঠল।

তিনি বললেন—"আর বল কেন, ঘরের পাশেই যুদ্ধ!"

—"সে কি! কোথায়?"

—"ওই তো চোখের সামনে।"

চেয়ে দেখি বরাহনগর-স্টেশনের লাগোয়া মাঠটাতে সৈন্যদের তাঁবু পড়েছে। রেল-লাইনের ধার দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া শুরু হচ্ছে। সামনের রাস্তা দিয়ে চলেছে মিলিটারি লরি, একটার পর একটা।

তিনি বললেন—"আকাশে আগে পাখি উড়তো, এখন ওড়ে বোমারু। দিনরাত সশব্দে উড়েই চলেছে। কোথায় যে যায়, কোত্থেকেই বা এত সব আসে বুঝে উঠতে পারি না। রোজই শুনি এ্যাকৃসিডেণ্টের কথা। কলকাতায় রোজই নাকি একটা-দুটো লরি-চাপা পড়ছে। শোভনলাল বলছিল কাল। ...সাবধানে চলাফেরা ক'রো।"

আর একদিন এমনি এক আলাপের আসরে, শুনলাম সিস্টার নিবেদিতার কথা। নিবেদিতার কথা বলতে গিয়ে তাঁর মুখচোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। বললেন—"নিবেদিতার মত দু'টি মেয়ে আর দেখি নি। অমন আর হয় না। সাদা পোশাক। তার ওপর গলায় ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। সে এক তপস্বিনীর মূর্তি। কেমন ক'রে তাঁকে বোঝাব। একখানা ফটোও ছিল আমার কাছে। একদিন লর্ড কারমাইকেল এসে সেটাকে নিয়ে গেলেন।"

এই নিবেদিতার আগ্রহে আর উৎসাহে শিল্পী নন্দলাল বসুকে অজন্তায় পাঠানো হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ সেই কথা তুলে বললেন—"তাঁর জন্যেই নন্দলালদের অজন্তায় যাওয়া ঘটে। নন্দলালকে বড় স্নেহ করতেন তিনি। কত উৎসাহ পেয়েছে নন্দলালরা। এমন কি নন্দলালদের জন্যে অজন্তায় রাঁধুনিও পাঠিয়েছিলেন তিনি, গণেন-মহারাজকে দিয়ে।—ভারতবর্ষকে নিবেদিতা যে কতখানি ভালোবেসেছিলেন আমি তা জানি। অন্তরের যোগ ছিল তাঁর ভারতের সঙ্গে।"

বিখ্যাত জাপানী শিল্পী ওকাকুরা-র নাম তোমরা শুনেছ বোধ হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। ওকাকুরা ভারতবর্ষে এসে অনেক জায়গা ঘুরে দেখে গেছেন। জাপানে গিয়ে টাইকান আর হিশিদা ব'লে দু'জন শিল্পীকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে তিনি পাঠিয়ে দেন ভারত-শিল্পকলার ছাত্র হিসেবে।

তিনি বললেন—"আর দেখেছি ওকাকুরাকে। মহাপুরুষের মত দেখতে। ধ্যানগম্ভীর চেহারা। সুরেনকে খুব ভালোবাসতেন তিনি। আমাদের জোড়াসাঁকোর স্টুডিয়োতে বহু আলোচনা করেছি তাঁর সঙ্গে, আর্ট নিয়ে। জাপানীরা

ওকাকুরাকে দেবতার মত ভক্তি করতো। ভারতের শিল্পকীর্তি দেখবার জন্যে তিনি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। অসুস্থ শরীরেও সেবার গেলেন পুরীতে। কোণারক দেখে বড় খুশি হয়েছিলেন ওকাকুরা।"

টাইকান এসেছিলেন জাপান থেকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় শিল্প শিক্ষার জন্যে। তাঁর কাছেও অবনীন্দ্রনাথ শিখেছেন লাইন-ড্রইং করতে, জাপানী-শিল্পীরা যে ভাবে করে। শিক্ষক-ছাত্র ব'লে তাঁদের সম্বন্ধ ছিল না। রীতিমত বন্ধুত্ব। অবনীন্দ্রনাথের এই হ'লো বড় গুণ যে, তিনি ছাত্রদের ওপর মাস্টারি করতেন না, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। টাইকানের প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলছিলেন—"টাইকানের কাছেই শিখেছিলুম কত ধীরে ধীরে তুলি দিয়ে একটি লাইন টানা যায়। আমার কাছেও শিখেছে অনেক। টাইকান কাজ করতো খুব। আমাদের দেশের গাছপালা, লতাপাতা, গয়না-গাঁটি কাপড়-চোপড়, মানুষের আদব-কায়দা রীতিমত স্টাডি করতো আর আঁকতো। বড় মজার মানুষ ছিল টাইকান। আমাদের স্টুডিয়োর জন্যে 'রাসলীলা'-র ছবি এঁকে দিয়েছিল সে। অদ্ভুতভাবে আঁকার পদ্ধতি তাদের। কয়লার টুকরো দিয়ে প্রথমটা সিল্কের ওপর ড্রইং ক'রে নিয়ে তারপর রঙ লাগায়। 'রাসলীলা'র সেই ছবিতে টাইকান ভারি সুন্দর ফুলকারি করেছিল। সরস্বতী, কালীর ছবিও এঁকেছিল টাইকান।"

গুণগ্রাহী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। যার যেখানে যে-বৈশিষ্ট্য যে-প্রতিভা তাঁর চোখে পড়ে, তিনি তার প্রশংসা করেন সানন্দে।

কথাপ্রসঙ্গে হিশিদা-র কথা উঠল।

তিনি বললেন—"হিশিদা যখন জাপান থেকে এলো, নেহাৎ ছেলেমানুষ তখন। ছেলেদের পোশাকে ঠিক যেন জাপানী মেয়ে। ভারি মিষ্টি চেহারা ছিল তার। খালি ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আর ছবি আঁকতো। রঙের জন্যে মাথা-ব্যথা ছিল না তার। মাটির টুকরো ঘ'সে, নয়তো গাছের ছুটো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাই ঘ'সে ঘ'সে সে দিব্যি ছবিতে রঙ লাগাতো। বেচারা অল্পবয়সেই মারা যায়। খুব বড় আর্টিস্ট হ'তে পারতো বেঁচে থাকলে।"

আর একদিনের ঘরোয়া-বৈঠকে বন্ধু মৌমাছি প্রশ্ন করলেন—"আপনাদের ছেলেবেলায় পুজোর কেমন আনন্দ হ'তো, বলুন না একটু।"

বর্মা-চুরুট-টা ধরাতে ধরাতে অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"তা, বেশ আনন্দ হ'তো সে-সময়। ছেলেবেলায় পুজো আসতো। আমাদের বাড়িতে পুজো না থাকলেও, পুজোর আবহাওয়া এসে লাগতো আমাদের বাড়িতে।

"পুজোর আগেই আসতো চীনেম্যান। বার্নিশ করা নতুন জুতোর জন্যে পায়ের মাপ নিতে। সব বাড়ির ছেলেরা মিলেই পায়ের মাপ দিতুম। অবাক হতুম তার মাপ নেওয়ার ধরন দেখে। এক টুকরো লম্বা ফালি কাগজ নিয়ে সব ছেলেদের একবার পায়ের লম্বা আর একবার বেড়টা মেপে নিয়েই ছেড়ে দিত। মাপ নেওয়ার ঐরকম যত্ন দেখে মনে আশঙ্কা হ'তো জুতো কোনদিন এসে পৌঁছবে কিনা। কর্তাদের চোখের আড়ালে চীনেম্যানের গা ঘেঁসে জিজ্ঞেস করতুম—জুতো কবে আসবে বলো না। ভালো করে মাপ নিয়েছ তো ? ফোস্কা পড়ে না যেন !

"নাকী-সুরে চীনে-সাহেব বলতো—ঠিক হোঁবে, বালো জুতো হোঁবে। চীনেম্যান ব'লে নাক কুঁচকে ঘেন্নায় অবহেলা করবার জো ছিল না। একবার কে যেন বলেছিল—'চীনেম্যান চুং চ্যাং, মালাইকা ভট্‌।' তার জন্যে তাকে ভয়ানক বকুনি খেতে হয়েছিল।"

—"পুজোর পোশাক পেতেন না ?" মৌমাছি প্রশ্ন করলেন।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"পেতুম না আবার ! দর্জি আসতো বাড়িতে। তার নামটা ভুলে গেছি। যতদূর মনে পড়ে—আবদুল। মাথায় গোল গম্বুজের মতো মস্ত একটা সাদা টুপি। পিঠে কাপড়ের পুঁটুলি। তার কাছে দিতে হ'তো সক্কলের জামার মাপ। সবুজ কিংখাপের থান, তার ওপর সোনালি বুটি। তাই ছিল ছেলেদের সবার পছন্দ। সব ছেলেদের এক রকম পোশাক।"

—"পুজোর পার্বনী পেতেন কি আপনারা ? আজকালকার ছেলে-মেয়েরা যেমন পায় ?"

—"আমরাও পেতুম পুজোর পাব্বনী। ছোটবড়র তফাৎটা কিন্তু তখনই ভালো ক'রে বোঝা যেত। বড়রা বেশি পেত আর ছোটরা পেত কম। বড়রা কেউ চার টাকা, কেউ আট টাকা—আর ছোটদের বয়স অনুযায়ী একটাকা থেকে শুরু ক'রে আট-আনা চার-আনায় গিয়ে ঠেকতো।"

কথায় কথায় উঠল গান-বাজনার কথা। পুজোর সময় যাত্রাগান হ'তো। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"নবমীর দিন যাত্রা বসতো কয়লাহাটায়।

ছোটকর্তা রামনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। ঐ দিন সন্ধ্যে থেকে সেখানে হাজির। খাওয়া-দাওয়া সব সেখানেই। চাকররা আমাদের খাটের ওপর শুইয়ে রেখে ব'লে যেতো—'এখন ঘুমোও, যাত্রা জমলে নিয়ে যাবো।' চাকরদের ভয়ে লক্ষ্মী-ছেলের মতো শুয়ে পড়তুম। ঘুমোবার ভাণ করতুম চুপ ক'রে শুয়ে থেকে। চাকরেরা চ'লে গেলে সেই খাটের ওপর ছেলেরা সবাই মিলে হৈ-হল্লা শুরু ক'রে দিতুম। ঢোল বাঁধা হচ্ছে, গিজতা-গিজুম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। 'এটা নিয়ে আয়', 'ওটা নিয়ে আয়', 'দই আন্, সন্দেশ আন্' এই সব কানে আসতো। এই করতে করতে কখন্ কে ঘুমিয়ে পড়তুম জানিনে। এক সময় রামলাল এসে বলতো—'ওঠো ওঠো, যাত্রা জমেছে।' ঘুমে তখনো চোখ জড়িয়ে থাকতো। চাকরেরা কোলে ক'রে নিয়ে গিয়ে আমাদের তখন যাত্রার আসরে বসিয়ে দিয়ে আসতো।"

—"যাত্রা কেমন হ'তো ?"

—"কী যে অভিনয় তা সব বুঝতে পারতুম না। তবে বেশ মনে আছে কখনো কখনো চোখে জল এসে যেতো। কখনো ভারি ভয় করতো। ভীম, রাবণ, কংস—ওদের হুংকার আর এ্যাকটিং শুনে বুক কেঁপে উঠতো। তার ওপর ভীমের গদাটা ছিল ভারি কৌতূহলের জিনিস। কাপড়ের খোলে তুলো ভর্তি করা থাকতো যে, তা কি জানতুম। ঐটে ঘুরিয়ে হারে-রে-রে ক'রে ভীম আসরে প্রবেশ করলেই পিলে চমকে যেতো।"

নিভে-যাওয়া সিগার-টা আবার ধরাতে ধরাতে তিনি বলতেন, "অধিকারী আসতেন যাত্রার আসরে চাপকান প'রে, মাথায় শামলা চড়িয়ে, বুকে গার্ড-চেন ঝুলিয়ে। জুড়িদের শুধু সাদা কাপড়ের ইজের আর চাপকান। রাজাদের গালপাট্টা, মোড়াশা পাগড়ি—মন্ত্রীরও তাই, খালি যা পাকা গোঁফ। নারদ এখনো যেমন, তখনো তেমন। ছেলেরা সব নোলক প'রে সখী সাজতো। মাথায় জরি দিয়ে জড়ানো বিনুনি চুল। বুকে উকিলদের মতো ক'রে ওড়না জড়ানো। তবে কারুর কারুর গোঁফদাড়ি কামানো হ'য়ে উঠতো না যে তাও দেখেছি।"

এমনি ধারা গল্প করতে করতে তিনি মেতে যেতেন। বেলা বেড়ে চলে। সেদিকে কারুরই হুঁস নেই। শেষটা চাকর যখন কাছে এসে দাঁড়ায় তখন তিনি থামেন। আমরাও বৈঠক ভেঙে দিয়ে উঠে পড়ি। কিন্তু মনে হয় ঘড়ির কাঁটাটা বড় তাড়াতাড়ি চলে, আর একটু ধীরে চল্‌লে তার এমন কি ক্ষতি।

খুড়ো-ভাইপো

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের কাকা, সে-কথা তো আগেই শুনেছ। একই পরিবারে প্রায় একই সময়ে এমন দু'টি প্রতিভার আবির্ভাব সচরাচর ঘটে না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কিন্তু সেই ঘটনাই ঘটেছিল। শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁর 'রবিকা'-র অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। খুড়ো-ভাইপোর সম্পর্ক ছিল সুনিবিড়। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধের মতো।

১৩৪৯ সালের কার্তিক মাসের এক সকালবেলা।

গিয়ে দেখি তিনি তাঁর গুপ্ত-নিবাসের বৈঠকখানার বারান্দায় একটা চেয়ারে ব'সে ঠুক্ ঠুক্ ক'রে কি করছেন। পাশেই একটা টেবিল। তার ওপরে গাছের গুটিকয়েক শুকনো ডালপালা, ছোট ছোট কয়েকটা পেরেক, কিছু সুতো, ছুরি, আর লোহার তার। কী যেন একটা করবার চেষ্টায় আছেন তিনি। আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন—"এই যে, এসো, এসো। ব'সো। তারপর, সকাল বেলায় যে হঠাৎ? খবর সব ভালো তো?"

—"হ্যাঁ, ভালোই। অনেক দিন আসিনি, এলাম আপনাকে দেখতে। শরীর ভালো আছে তো?"

—"না! ভালো আর কই? সর্দি হয়েছে, দেখছ না কোট গায়ে দিয়েছি!" তাকিয়ে দেখি সত্যি তাই।

হেসে প্রশ্ন করলাম—"দাড়ি রাখছেন যে, হঠাৎ?"

তিনিও একটু হেসে জবাব দিলেন—"নাপিত মেলে না এদেশে! তাছাড়া বুড়ো হয়েছি, এই তো বেশ! দিদিমণির কিন্তু ভারি পছন্দ। দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেয়। আবার মাঝে মাঝে টেনে দেখে সত্যি দাড়ি, না false! টানের চোটে আমার যে কি অবস্থা, সেটা আর সে বিবেচনা ক'রে দেখে না। আমার দাড়িটা হয়েছে ওর খেলবার জিনিস। ওদের সঙ্গে আমার মেলে

ভালো। বুড়ো ব'লে ওরা তোমাদের মতো আমাদের এড়িয়ে যায় না। বরং কাছে এসে ভাব জমাতেই চেষ্টা করে। তোমরা তরুণ, তোমাদের কিন্তু ভয় ক'রে চলি।" ব'লেই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

—"আজ কিন্তু আপনার মুখে রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প শুনব। বিশেষ ক'রে ছেলেবেলায় আপনাদের কেমন কেটেছে—সেই সব কথা।"

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে জবাব দিলেন—"রবিকা'-র কথা নতুন ক'রে আর কী বলব। 'ঘরোয়া'তেই তো অনেক কথা জানতে পেরেছ। আচ্ছা চলো, দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসি। সেখানেই গল্প করা যাক।"

দোতলার বারান্দায় গিয়ে আমরা বসলাম।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"রবিকা এই বাড়িতে বহুদিন থেকে গেছেন। ওই ঘরে তিনি শুতেন। আর এই বারান্দায় প্রায়ই এসে বসতেন তিনি। এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। রবিকা-র কথা মনে হয় সব সময়।

"রবিকা আমার চেয়ে দশ বছরের বড়ো। কাজেই সে দশ বছরের কথা আমি জানি না। পরে অবিশ্যি লোকের মুখে শুনেছি। তার পর যখন বড় হলুম,—মানে, বোঝবার যখন বয়স হ'লো,—তখন দেখতুম রবিকা যেন আমাদের সকলের চেয়ে আলাদা। ভিন্ন ধরনের। জানোই তো আমাদের পরিবারে গুরুজনদের সঙ্গে ছোটোরা আজকালকার ছেলেদের মতো মেলামেশার সুযোগ পেতো না। বড়োদের আর ছোটোদের মাঝখানে ছিল একটা বিরাট ব্যবধান। কিন্তু আমার সঙ্গে রবিকা-র সে সম্বন্ধ ছিল না। আমাকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন তিনি। বহুবিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন সাহস দিতেন।"

প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা, ছেলেবেলায় যখন আপনি তাঁকে দেখেছেন তখন কি তিনি খুব দুষ্টু ছিলেন? এই আপনি যেমন—" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি।

—"না, না, রবিকা মোটেই দুষ্টুমি করতেন না। একদম লক্ষ্মীছেলে যাকে বলে—গুড্‌বয়। আমার মতো দস্যিপনা আর কেউ করতো না বাপু। রবিকা-কে প্রায়ই দেখতুম বারান্দায় পায়চারি ক'রে বেড়াতে, নয়তো দেখতুম বারান্দায় ব'সে আছেন চুপটি ক'রে। ছেলেবেলায় ওঁর মতো শান্ত ছেলে খুব কম দেখা যায়।"

কথায় কথায় একবার বললেন—"ছোটোবেলায় আমরা সব পড়া-পড়া খেলা খেলছি, দীপুদা আমাদের মাস্টার। ঠিক হ'লো আমাদের সেই খেলাঘরের ইস্কুলে প্রাইজ ডিস্‌ট্রিবিউশন হবে। নইলে ছাত্রদের উৎসাহ হবে কেন! কিন্তু প্রাইজ ডিস্‌ট্রিবিউশন করবার একজন লোক চাই তো? সভাপতি গোছের। দেখা গেল বারান্দায় রবিকা পায়চারি করছেন। তিনি বড়ো একটা আসতেন না আমাদের খেলায়। একলা থাকতে ভালোবাসতেন সব সময়। আমরা গিয়ে তাঁকে ধরলুম—আমাদের প্রাইজের জন্যে। রবিকা নেমে এলেন। ছোটখাটো সভা ক'রে প্রাইজ দেওয়া হ'লো—খেলাঘরের ইস্কুলের সেই প'ড়োদের। রবিকা খুব শুদ্ধভাষায় একটা বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। কি প্রাইজ আমরা পেয়েছিলুম বলো তো?

—"বই-টই নিশ্চয়ই?"

—"উঁহু। চিনেবাদাম, গুলাবি রেউড়ি—এই সব।"

অবনীন্দ্রনাথের মুখেই সেদিন শুনতে পেলাম যে, কবিগুরু ছিলেন ভাইয়েদের মধ্যে কালো। শুনে কেমন অবাক লাগ্‌ল। অমন সুন্দর চেহারা, অমন গায়ের রঙ—সে যদি কালো হয় তাহ'লে তো আর-সব ভাইয়েদের রঙ আরো বেশি উজ্জ্বল ছিল।

'ঘরোয়া'তে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"সাত সাত ছেলে কর্তাদিদিমার—তাঁকে বলা হ'তো রত্নগর্ভা। কর্তাদিদিমার সব ছেলেরাই কী সুন্দর দেখতে, আর কী গায়ের রঙ—তাদের মধ্যে রবিকাকাই হচ্ছেন কালো। কর্তাদিদিমা খুব ক'ষে তাঁকে রূপটান সর মাখাতেন। সে-কথা রবিকাও লিখেছেন তাঁর 'ছেলেবেলা'য়। কর্তাদিদিমা বলতেন—'সব ছেলেদের মধ্যে রবিই আমার কালো।' সেই কালো ছেলে দেখো জগৎ আলো ক'রে ব'সে আছেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের অভিনয়ের কথা উঠল।

তিনি বললেন—"রবিকার সঙ্গেই বেশি অভিনয় করেছি। ওঁর এ বিষয়ে ভারি উৎসাহ ছিল। একবার রবিকা 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় 'কেদার'-এর পার্টে অভিনয় করতে গিয়ে যা সেজেছিলেন, কি বলবো। কালিঝুলি মেখে অদ্ভুত এক চেহারা। চেনাই দায়। চোখ ব'সে গিয়েছে, গাল গিয়েছে ভেঙে—আমরা তো অবাক। আমি তখন রবিকাকে বললুম—

'একি রবিকা, এ তুমি করেছ কী। অমন সুন্দর চেহারাখানা একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলেছ।"

—"মেক্-আপের দিকে তাহ'লে ওঁর খুব নজর ছিল?"

—"হ্যাঁ, বরাবরই রবিকা-র বেশ দৃষ্টি ছিল মেক্-আপের দিকে। নিখুঁত ভাবে করতে চাইতেন সব। একবার কিন্তু রবিকা ভারি মুশকিলে পড়েছিলেন তাঁর দাড়ি নিয়ে। সাদা দাড়ি, রঙ মেখে একেবারে কালো ক'রে ফেলেছেন। অভিনয়ের পর হ'লো ফ্যাসাদ। রঙ তুলতে যাবেন, কিন্তু সে রঙ আর ওঠে না। শেষটা অনেক চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে সে-যাত্রা রক্ষা পান।

"তাই দেখে আমি এক উপায় বের ক'রে ফেল্লুম। মেয়েরা তাঁদের খোঁপায় কালো একরকম জাল পরেন দেখেছ তো? সেই ধরনের কালো জাল কিনে এনে রবিকার দাড়ি তাই দিয়ে ঢেকে দিলুম—পরের বারে অভিনয় করবার সময়। দূর থেকে সবাই দেখলে রবিকার কুচ্‌কুচে কালো দাড়ি। কেউ বুঝতেই পারলে না ফাঁকিটা কোথায়।"

ঠাকুরবাড়িতে একসময় অভিনয়ের খুব রেওয়াজ ছিল। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এই ব্যাপারে অগ্রণী। অবনীন্দ্রনাথও থাকতেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির এই সব নাটক অভিনয়ের একটা বিশেষত্ব ছিল যে, পরিবারের ছেলেমেয়েরাই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতেন। অনেক বড় বড় খ্যাতনামা লোক আর সাহেব-সুবো আসতেন এই সব অভিনয় দেখতে।

কথাপ্রসঙ্গে একবার অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"জানো, রিহার্সেল দিতে গিয়ে একবার দেখি, আমরা পার্ট সব ভুলে যাচ্ছি। রবিকারও আটকে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কি জানি কেন মুখস্থ হচ্ছে না ঠিকমতো।

"হঠাৎ মাথায় এক ফন্দি ঢুকলো। রবিকা-কে বললুম—পার্ট তো ভুলে যাচ্ছি, মনে থাকছে না। শেষটা স্টেজে নেমে কী কাণ্ড ক'রে বসব কে জানে। প্রম্প্‌টারের প্রম্পটিংও সব কানে আসে না ভালো মতো। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, প্রম্পটারকে স্টেজে নামাই।

"রবিকা তো অবাক হ'য়ে গেলেন। বল্লেন—সে-কি।

"আমি তখন প্রম্পটারদের বোরখা পরিয়ে স্টেজে নামিয়ে দিলুম। বোরখার নিচে রইল বই। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। তারা আমাদের সঙ্গে স্টেজে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো দৈত্যদানার মতো। বেশ একটা এফেক্ট হয়েছিল তা'তে। পার্ট ভুলে যাবার উপক্রম হ'লেই প্রম্পটারের

পাশে গিয়ে দাঁড়াই, তারাও নেচে নেচে কাছে এসে পার্ট ব'লে দিয়ে যায়। আর কোনো অসুবিধে নেই। একবার দেখি রবিকাও ঘাড় কাৎ ক'রে প্রম্পটারের কাছ থেকে পার্ট শুনে নিচ্ছেন আর অভিনয় করছেন। অথচ মজা এই, এতে ক'রে কিন্তু নাটকের কোনো অঙ্গহানি হয়নি, বেশ ভালোই জমেছিল।"

রবীন্দ্রনাথের কথা বল্‌তে গিয়ে তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভালো ক'রে চেয়ারটায় ব'সে নিয়ে আবার বল্‌তে শুরু করেন—"রবিকা আমায় বড়ো ভালোবাসতেন। শান্তিনিকেতনে গেলে আমি কোথায় থাকবো, কোন্ ঘরে শোবো, এই নিয়ে তাঁর হুলুস্থুল কাণ্ড। আমার জন্যে ঘর সাজানো হয়। সে তো ঘর নয়, যেন বাসরঘর!"

নিভে-যাওয়া বর্মা-চুরুটটা ধরিয়ে আবার তিনি বল্‌লেন—"রবিকার সামনে আমি কিন্তু চুরুট খেয়েছি। একদিন হয়েছে কি—ভারি এক মজার কাণ্ড। ছেলেবেলাকার কথা নয়। রবিকা বোলপুরে চ'লে যাবার কয়েকদিন আগেকার কথা। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ব'সে তিনি যেন কী লিখছিলেন। আমি পাশেই ব'সে ছিলুম। বল্‌লুম—'রবিকা, ভালো চুরুট পেয়েছি, খাবে? টেনেই দেখনা একটা। তাহ'লে বেশ লিখতে পারবে।' রবিকা বল্লেন—'আচ্ছা, দাও তো দেখি।' তারপর কী হ'লো জানো? যেই গোটাদুই টান দিয়েছেন, ব্যস্, খক্ খক্ ক'রে সে কী কাসি! মুখচোখ একেবারে লাল হয়ে উঠলো। আমি তো বোকা ব'নে গেলুম। রবিকা আমায় চুরুটটা ফেরৎ দিয়ে বল্লেন—'নাও, অবন। এই বুঝি তোমার ভালো চুরুটের নমুনা!"

আর একদিনের ঘরোয়া বৈঠকে কথাপ্রসঙ্গে বন্ধু 'মৌমাছি' অবনীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, গল্প লেখা আপনি শিখলেন কেমন ক'রে?"

জবাবে তিনি বললেন—"ও জিনিসটা আমার আসতোই না। রবিকাই আমার গল্প লেখার বাতিকটা ধরিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে সাহস দিয়েছিলেন—গল্প-লেখায় হাত দিতে। একদিন রবিকা আমায় বল্লেন—'অবন, তুমি লেখো-না,—যেমন ক'রে তুমি মুখে মুখে গল্প ক'রে শোনাও, তেমনি ক'রেই লেখো।' আমার কিন্তু সাহসে কুলোয় না কলম নিয়ে বসতে। রবিকাই মাঝে মাঝে উৎসাহ দেন। ভরসা দিয়ে বলেন—'তুমি লিখে যাও,

আমি তো আছিই। ভাষার কোনো দোষ হ'লে তার ভার আমার ওপরেই না-হয় ছেড়ে দিয়ো, শুধ্‌রে দেবো।' এমনি ক'রে তাঁর উৎসাহ আর ভরসা পেয়েছিলুম ব'লেই না কলম ধরতে সাহস করেছিলুম। আমার লেখা প্রথম গল্প হচ্ছে শকুন্তলা। রবিকা দেখলেন। আগাগোড়া ভালো ক'রে পড়লেন বইখানা। কিছু কাটাকুটি করলেন না। জানলুম—আমিও তাহ'লে গল্প লিখতে পারি। উৎসাহ বেড়ে গেল। ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী লিখে ফেললুম পটাপট। রবিকার জোরেই আমার লেখার বাতিকটা এসেছিল।"

কথায় কথায় ছবির প্রসঙ্গ উঠল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"এই দেখ, ছবি। ছবি-আঁকার ব্যাপারেও কি কম উৎসাহ পেয়েছি রবিকার কাছ থেকে? রবিকার চিত্রাঙ্গদা তখন লেখা শেষ হয়েছে। আমায় ডেকে বল্লেন—'অবন, তোমায় ছবি দিতে হবে চিত্রাঙ্গদার জন্যে।' বাড়িতেই তখন আমি স্টুডিয়ো খুলে বসেছি। সেখানেই রবিকা-তে আর আমাতে আর্ট নিয়ে প্রথম যোগ। চিত্রাঙ্গদার ছবি কেমন ক'রে আঁকা হবে, তিনি তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তার সমস্ত ছবি আমি নিজের হাতে এঁকেছি। কী উৎসাহ তখন।"

'জোড়াসাঁকোর ধারে'-তে তিনি এই প্রসঙ্গেই বলেছেন—"রবিকার সঙ্গে বহুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে, আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।"

অল্প বয়স থেকেই সঙ্গীতের দিকে অবনীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল। এক সময় তিনি খুব ভালো এস্‌রাজ বাজাতে পারতেন। ঠাকুরবাড়িতে তো গান-বাজনা লেগেই থাকত। রবীন্দ্রনাথ গান গাইতেন, আর তাঁর সঙ্গে এস্‌রাজ বাজাতেন অবনীন্দ্রনাথ। খুড়ো-ভাইপোর এই গান-বাজনার ফটো তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ কাগজে। অবনীন্দ্রনাথের মুখে একথা প্রায়ই শুনেছি—"গান গাইতেন বটে রবিকা। সে-গান তোমরা শোনোনি। কিন্তু আমি শুনেছি তাঁর গান, প্রাণ মন একেবারে ডুবে যেতো তাঁর গানে গানে।"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একবার এক সঙ্ঘ গ'ড়ে ওঠে। তার নাম ছিল 'খামখেয়ালী'। এই 'খামখেয়ালী' নামটি দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

আজকাল যেমন অনেক সাহিত্য-সমিতি দেখতে পাওয়া যায়, যাদের এক একটা বৈঠক বসে প্রত্যেক সভ্যের বাড়িতে পালা ক'রে—তেমনি এক সমিতি ছিল ঐ 'খামখেয়ালী'। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই সেটি গ'ড়ে ওঠে। মাসে একটা ক'রে মজলিশ বসতো 'খামখেয়ালী'র প্রত্যেক সভ্যের বাড়িতে। সভ্যরা প্রত্যেকেই তা'তে একটা না একটা বিষয় নিয়ে কিছু পড়তেন। এই 'খামখেয়ালী'র সুন্দর বিবরণ আছে 'ঘরোয়া'-তে।

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গে তিনি সেখানে বলেছেন—"সেই খাম-খেয়ালীর যুগে রবিকাকাকে দেখেছি, তাঁর তখন কবিত্বের ঐশ্বর্য ফুটে বের হচ্ছে। চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িতেও ছিলেন তিনি সবার আদরের। বাবামশায় যখন সভায়-মজলিশে 'রবির একটা গান হোক' বলতেন, সে যে কী স্নেহের সুর ঝ'রে পড়তো। তখন রবিকা'র গাইবার গলা কী ছিল, চারিদিক গম্ গম্ করতো। বাড়িতে কিছু একটা হলেই তখন 'রবির গান' না হ'লে চলতো না।...এখনো সে-সব গানের সুর কানে লেগে আছে যেন।"

ঘরোয়া-তেই তিনি বলেছেন—"প্রকাণ্ড ইনটেলেক্ট্ অমন আমি দেখিনি আর। বটগাছ যেমন নানা ডালপালা ফুল ফল নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে, রবিকাকাও তেমনি বিচিত্র দিকে ফুটে উঠলেন। যেটা ধরেছেন, এমন কি ছোটো গল্প, তাতেও কথা কইবার জো নেই, সব-কিছু এক-একটি সম্পদ। লোকে বলে এক্সপিরিয়েন্স নেই, কল্পনা থেকে লিখে গেছেন, তা একেবারেই নয়। লোকে খামখেয়ালীর যুগে থাকলে বুঝতে পারতো।"

কলকাতায় একবার খুব প্লেগ লাগে।

সেবারে ঘরে ঘরে একটা আতঙ্কের ছায়া। মহামারী শুরু হয়েছে—লোক মারা যাচ্ছে খুব। তখন অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ সবাই মিলে হাসপাতাল খোলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে চাঁদা আদায় করেছেন, চুন বিলি করেছেন পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ, সিস্টার নিবেদিতা এঁরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে প্লেগের তদারক ক'রে বেড়াতেন। কোথায় কি দরকার তার সব ব্যবস্থা করতেন। অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন তাঁদের সেবাকার্যের একজন সঙ্গী। স্বদেশী যুগে খুড়ো-ভাইপো মিলে কত যে কাজ করেছেন তার ঠিক নেই।

'ঘরোয়া'তে পাই এই স্বদেশী যুগের কথা।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে জানে বিলাসী ব'লে। তিনি শুধু বিলাসিতা ক'রেই কাটিয়েছেন দেশের দিকে তাকাননি এ যারা জানে, তারা ভুল জানে।

রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের মতো স্বদেশ-ভক্ত দেশে খুব কমই আছেন। তাঁরা স্বদেশের জন্যে যা করেছেন তার মধ্যে মিথ্যা কোনো আড়ম্বর নেই, অন্তরের তাগিদে তা করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথই বলেছেন—"তখনকার স্বদেশী যুগে এখনকার মতো মারামারি ঝগড়াঝাঁটি ছিল না। তখন স্বদেশীর একটা চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে। এমন একটা ঢেউ যাতে দেশ উর্বরা হ'তে পারতো, ভাঙতো না কিছু। সবাই দেশের জন্যে ভাবতে শুরু করলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্যে কিছু করতে হবে।"

এই যে 'দেশের জন্যে কিছু করা'—এই অনুপ্রেরণাতেই সবাই সেদিন জেগে উঠেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এসে ঠাকুরবাড়ি ভাসিয়ে দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মেতে ওঠেন তরুণদের নিয়ে। অবনীন্দ্রনাথদের নিয়ে খুলে দিলেন—'স্বদেশী ভাণ্ডার'। স্বদেশী জিনিসে ভ'রে ওঠে সেই দোকান। শুধু দোকান নয়, তাঁদের চেষ্টাতেই নানা জায়গাতে সেদিন গ'ড়ে ওঠে—পল্লীসমিতি, সেবা-সমিতি। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ ছোটেন চাঁদার খাতা নিয়ে 'মাতৃভাণ্ডার'-এর জন্যে চাঁদা তুলতে। খবর পেলেন রেলের কুলিরা চাঁদা দিতে চায় যদি তাঁরা একবার তাদের কাছে হাজির হন। অমনি খুড়ো-ভাইপোর স্বদেশী দল ছুটল কোন্ রামকেষ্টপুরে রেলের কুলিদের কাছে চাঁদা আদায় করতে। তখন বর্ষাকাল—রীতিমতো জল পড়ছে সেদিকে তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। রেলগাড়ির নিচে সতরঞ্চি বিছিয়ে তাঁদের সভা বসে, বক্তৃতা হয়, চাঁদা ওঠে।

স্বদেশী যুগ। ঘরে ঘরে তখন চরকা চল্‌ছে ঘর্ ঘর্ ক'রে। তাঁত চল্‌ছে খটাখট। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িও বাদ যায়নি। চরকায়-কাটা স্বদেশী সূতোয় গামছা ধুতি সব তৈরি হ'তে লাগল। অবনীন্দ্রনাথের মা নিজের হাতে ধুতি তৈরি ক'রে ছেলেদের দিয়েছেন পরতে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সেই ছোটো ধুতি, হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের কত উৎসাহ।"

আগেই তোমাদের বলেছি যে, অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগের অনুপ্রেরণায় বাড়ির সবকিছু স্বদেশী ছাঁচে গ'ড়ে তোলেন। বিদেশী আসবাবপত্রের জায়গায় তাঁর ঘরে দেখা দেয় দিশি আসবাবপত্র। চাল-চলনে পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় তাঁরা সবাই বিলিতিয়ানা, বিদেশী ঢঙ বর্জন করেছিলেন।

আমাদের দেশে ইংরেজিওয়ালা লোকের অভাব নেই। তাঁরা ইংরেজিতে চলেন, ইংরেজিতে বলেন, ইংরেজি কায়দায় ওঠেন বসেন,—এমন কি

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন সেও ইংরেজি ধরনে। এমন লোক নিয়ে যে সমাজ, তাদের লোকে বলে ইঙ্গবঙ্গ। দেশী হয়েও তাঁরা বিদেশী।

এই রকম ইঙ্গবঙ্গ সমাজে একদিন রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথদের নেমন্তন্ন। পার্টি হবে সেখানে। নেমন্তন্নে যাবার সময় প্রশ্ন উঠল কী সাজে যাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সবাইকে ধুতি-চাদর প'রে যেতে বললেন।

এই প্রসঙ্গে 'ঘরোয়া'-তে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পরলুম ধুতিপাঞ্জাবী, পায়ে দিলুম শুঁড়-তোলা পাঞ্জাবী চটি। এখন, খালি পায়ে কী ক'রে যাই। চেয়ে দেখি রবিকাকার পায়ে মোজা, আমরাও চটপট মোজা প'রে নিলুম।... তখনকার দিনে মোজা ছাড়া চলা, সে একটা ভয়ানক অসভ্যতা। আমি, দাদা, সমরদা, ও রবিকাকা সেজে-গুজে রওনা হলুম। সবাই আমরা মনে মনে ভাবছি, ইঙ্গবঙ্গের কেল্লায় কী রকম অভ্যর্থনা হবে, ভেবে একটু হৃৎকম্পও হচ্ছে। কিছুদূর গেছি, দেখি রবিকাকা হঠাৎ এক এক টানে দু'পায়ের মোজা দুটো খুলে গাড়ির পা-দানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমাদের বললেন, আর মোজা কেন, ও খুলে ফেলো। আগাগোড়া দিশি সাজে যেতে হবে।"

অবনীন্দ্রনাথরাও তাই করলেন—সবাই মোজা খুলে ফেল্‌লেন। তারপর, পার্টি যখন বেশ জমে উঠেছে তখন তাঁরা চারজন সেখানে গিয়ে উপস্থিত। না বল্‌লেও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, তাঁদের সেই সাজ-পোশাক দেখে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কেউ খুশি হ'লেন না, বরঞ্চ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেন। রীতিমতো চ'টে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাতে অবনীন্দ্রনাথদের কিছু যায়-আসেনি। তাঁরা মনে প্রাণে সেদিন থেকে আরো বেশি স্বদেশভক্ত হয়ে উঠলেন।

কলকাতায় সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। নানান প্রদেশের কংগ্রেসী নেতারা যোগ দিয়েছিলেন তাতে। ঠাকুরবাড়িতে তাঁদের সবাইকে এক পার্টিতে অভ্যর্থনা করা হবে ঠিক হ'লো। আর এও ঠিক হ'লো যে, যাঁরা সেই সভায় আসবেন তাঁদের সবাইকে স্বদেশী পোশাকে আসতে হবে।

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমি বলি, সে কী ক'রে হবে। রবিকাকা বললেন—না, তা হ'তেই হবে। তিনি নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপিয়ে দেওয়ালেন, All must come in national dress (সবাইকে জাতীয় পোশাকে আসতে হবে)।

আজকাল তোমরা কর রাখীবন্ধন-উৎসব। শ্রাবণ-পূর্ণিমার সেই শুভদিনটিতে পরস্পরের হাতে রাখীর রঙীন সূতো বেঁধে দিয়ে তোমরা পরস্পরের কল্যাণ কামনা কর। একদিন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই এই রাখীবন্ধন-উৎসবের ব্যাপক আয়োজন হয়েছিল।

সকালবেলায় সবাই গঙ্গাস্নান করতে চল্‌লেন। স্নানের পর সবার হাতে ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন হিসেবে সেই 'রাখী' বেঁধে দেবেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, বাড়ির প্রায় সবাই চল্‌লেন পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নানে। মনিব-চাকর সবাই চল্‌ল একসঙ্গে। একসঙ্গে তাঁরা সবাই স্নান করবেন। কোনো ভেদাভেদ থাকলে চল্‌বে না। সেই রাখীবন্ধন-উৎসবের শোভাযাত্রা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার ক'রে গেছেন যে, সে দৃশ্যের তুলনা নেই। শোভাযাত্রা চলেছে জগন্নাথ-ঘাটের দিকে রাস্তা দিয়ে। সেই দৃশ্য দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে লোক জমেছে রাস্তার দু'পাশে, বাড়ির জানালায়, ছাদে,—বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ে বৌ-ঝি বুড়ো-বুড়ী সবাই দেখছে সেই অপূর্ব দৃশ্য। বাড়ির মেয়েরা সব খৈ ছড়াচ্ছেন, শাঁখ বাজাচ্ছেন, আর রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথদের সেই দল গাইতে গাইতে চলেছেন—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান॥

স্নানের ঘাটে তাঁদের দেখবার জন্যে লোকে লোকারণ্য। স্নান সেরে সবাই রাখী পরাতে লাগলেন। কেউ বাদ পড়ল না। সেদিন যেন মিলনের উৎসব, সবার মনে প্রাণে সেদিন খুশির বন্যা এসেছে। মনিব-ভৃত্যের কোনো তফাৎ নেই, উঁচু-নিচুর কোনো ভেদাভেদ নেই, জাতিগত গরমিলের বালাই নেই সেদিন। মিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে সেদিন সবাই হাতে পরলেন রাখীবন্ধনের রঙীন সূতো—মিত্রতা ও ভ্রাতৃত্বের পুণ্য-সূত্র।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ মেতে উঠেছেন মহা উৎসাহে। অন্তর থেকে প্রেরণা পেয়েছেন তিনি। কে হিন্দু কে মুসলমান সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। সবার হাতে বেঁধে দিচ্ছেন সেই 'রাখী' আর কোলাকুলি করছেন সবার সঙ্গে। সেই কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'-তে বলেছেন—

"পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ ক'রে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে—এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি।"

বরানগরের বাড়িতে আর একদিনের বৈঠকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বাংলাভাষায় কথা। বাঙালীর সভাসমিতিতে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। বলেন—'ওতে আত্মমর্যাদা বাড়ে না, বরং ক্ষুণ্ণ হয়।'

এই প্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলেছিলেন—"রবিকাকাই প্রথম প্রতিবাদ জানালেন সভা-সমিতিতে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার বিরুদ্ধে। নাটোরে যেবার প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বসে, সেবারেই রবিকা বললেন বাংলাভাষায় কন্‌ফারেন্সের সব বক্তৃতা হবে। আমরা তখন তরুণ, সবাই আমরা রবিকার দলে। কিন্তু গোল বাধল চাঁইদের সঙ্গে, তাঁরা বল্লেন, না, ইংরেজিতেই সব হবে। কিন্তু জিতলুম আমরা। হ'লো কি জানো, যিনিই বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ান, আর যেই ইংরেজিতে বলতে শুরু করেন, অমনি আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলি—বাংলা, বাংলা। শেষটা বাংলাতেই কনফারেন্স হ'লো। পুরোদস্তুর সাহেব লালমোহন ঘোষ সেদিন বাংলাভাষায় এমন চমৎকার বক্তৃতা দিলেন, সে রকম আর শুনিনি। রবিকা ছিলেন ব'লেই আমাদের সাহস সেদিন বেড়ে গিয়েছিল। বাংলা-ভাষার সেদিন জয়-জয়কার।"

সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, দেশের কাজে সবকিছুতেই অবনীন্দ্রনাথ চিরদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মুখের কথাই উদ্ধৃত ক'রে প্রসঙ্গ শেষ করি। তিনি বলেছেন—"সুমধুর স্মৃতি তেমন ছিল না জীবনে। তবে কবির সঙ্গ পেয়েছি, সেই ছিল জীবনের একটা মস্ত সম্পদ। মা-ও বুঝতেন, বলতেন—রবির সঙ্গে আছিস, বড় নিশ্চিন্ত আমি।"

মানুষ

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে যাঁরা কেবল শিল্পী হিসেবে দেখেছেন তাঁরা দেখেছেন একরকম, আর যাঁরা দেখেছেন তাঁকে মানুষ হিসেবে তাঁরা দেখেছেন তাঁর আর এক রূপ। অবনীন্দ্রনাথ যদি ভারতের শিল্পীদের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করেন, তা'হলে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবেও তাঁকে আমরা শ্রদ্ধার আসন দেব। এমন মানুষ সংসারে দুর্লভ।

রাজার হালে তিনি মানুষ হয়েছেন। দাস-দাসী, চাকর-চাকরানীর কোনো অভাব ছিল না। ঐশ্বর্য-স্থখে তাঁর শৈশব কেটেছে। কিন্তু কোনদিনই বিলাসিতার পাঁকে তিনি জড়িয়ে পড়েননি, অর্থের মোহে নিজেকে ভুলে যাননি। এমন সাদাসিধে মানুষ সংসারে খুব কম দেখা যায়। তাঁর অন্তরে ও বাহিরে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর কাছে সবাই সমান। চেনা-অচেনায় ভেদ নেই, তাঁর কাছে যে যখন গিয়ে হাজির হয়েছে তিনি তখনই তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছেন। তাঁর দ্বার সবার জন্যে সব সময় অবারিত।

নিজেকে কোনদিন তিনি প্রচার করতে চাননি। আত্মপ্রকাশের চেয়ে তিনি নিজেকে বিশ্বের কোলাহল থেকে সরিয়ে নিয়ে আত্মগোপন ক'রে থাকতেই ভালোবাসেন।

কথায় কথায় একদিন তিনি বলেছিলেন—"আমি বাপু আর্টিস্‌ট মানুষ, —সাহিত্যিক নই। লিখতে ব'সে যা ভালো লেগেছে তাই লিখে গেছি। সাহিত্য স্থষ্টি করেছি কি না জানি না। আজকাল তোমরা আবার বলতে শুরু করেছ—আচার্য। ও আচার্য-টাচার্য ব'লে কেন তোমরা আমায় অত বড়ো ক'রে দেখ? আমি সাধারণ মানুষ। আমার ছবি তোমাদের ভালো লাগে, সেই তো আমার পুরস্কার। নামের আগে কতকগুলো বিশেষণ জুড়ে দিলেই কি খুব বড়ো হয়ে যাবো।"

এইখানেই অবনীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। নাম যশ তিনি কোনদিনই চাননি। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তিনি আপন মনে শুধু শিল্পস্থষ্টি ক'রে গেছেন। লোকের ভালো লেগেছে সেইখানেই তাঁর সুখ, পরম পরিতৃপ্তি।

আর্ট-স্কুলের প্রদর্শনীতে একবার অবনীন্দ্রনাথের 'পদ্মাবতী' ছবিখানি প্রদর্শিত হ'লো। হ্যাভেল-সাহেব তখন তার মূল্য নির্ধারণ ক'রে দিলেন আশি টাকা। প্রদর্শনী দেখতে এলেন লর্ড কার্জন। 'পদ্মাবতী' ছবি দেখে তিনি খুব খুশি হ'লেন। ষাট টাকার মতন দিতে চাইলেন ছবিখানার জন্যে। হ্যাভেল-সাহেব কিন্তু ও-দরে দিতে চাইলেন না। অবনীন্দ্রনাথ তখন হ্যাভেল-সাহেবকে কাছে ডেকে এনে কী বলেছিলেন জানো? তিনি বলেছিলেন—"সাহেব, দিয়ে দাও, টাকামাকা চাইনে কিছু। লর্ড কার্জন চেয়েছেন ছবিখানা, সেই তো খুব দাম।"

পরে অবশ্য ছবিখানা কাউকে দেওয়া হয় না। অবনীন্দ্রনাথ শেষকালে 'পদ্মাবতী'-ছবির সঙ্গে আরো দুতিনখানা ছবি হ্যাভেল-সাহেবকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে দান করেন।

নীরবে ও গোপনে তিনি বহুলোকের বহুপ্রকারে উপকার করেছেন, সাহায্য করেছেন। বহু শিক্ষার্থীকে তিনি এক সময় থাকবার জায়গা ক'রে দিয়েছেন, পড়বার খরচ পর্যন্ত জুগিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্য, শিল্পী শ্রীমুকুল দে একজায়গায় লিখেছেন—"কাহারও বাড়িঘর, জায়গা-জমি করিয়া দিয়া, কাহাকেও বা কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়া এই শিল্পীশ্রেষ্ঠ মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি নিজেও তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। ১৯১৭ সালে আমার পিতার মৃত্যুকালে ও কয়েক বৎসর পূর্বে আমার মারাত্মক পীড়ার সময়ে তিনিই আমাকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অশেষ উপকার আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।"

ছাত্রদের তিনি চিরকাল উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। নিজের হাতে তাদের গ'ড়ে তুলেছেন। অনেক সময় তিনি তাঁর ছাত্রদের ছবির ভাব দিতেন, সংশোধন ক'রে দিতেন পর্যন্ত। ছাত্রদের ছবি যাতে আগে থাকতে বিক্রি হয়ে যায় সেজন্যে তিনি বাৎসরিক প্রদর্শনী খোলবার আগেই তাঁর চিত্ররসিক বন্ধুদের ডেকে এনে ছাত্রদের ছবি কিনিয়ে রাখতেন। তারপর প্রদর্শনীর যখন উদ্বোধন হ'তো তখন তাঁর ছাত্রেরা এসে দেখত যে তাদের ছবি বিক্রি হ'য়ে গেছে। নীরবে এমনি ক'রেই তিনি চিরকাল তাঁর ছাত্রদের সস্নেহে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন।

একবার অনেক টাকা পেলেন অবনীন্দ্রনাথ—রাজার জন্যে বসবার মঞ্চ

তৈরি ক'রে। ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মঞ্চের কারুকার্য করলেন। খুব সুন্দর হয়েছিল রাজার সেই বসবার মঞ্চটি। পারিশ্রমিক-স্বরূপ পেয়েছিলেন হাজার কয়েক টাকা। রাজা চ'লে যাবার পর মঞ্চের ছবিগুলো কিনে নিলেন বর্ধমানের মহারাজা ছ'শো টাকা দিয়ে। অনেক টাকা হ'লো। কিন্তু সে টাকা তিনি নিজে নিলেন না, ভাগাভাগি ক'রে বিলিয়ে দিলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে।

প্রকৃতিকে বড় ভালোবাসেন অবনীন্দ্রনাথ। বরানগরের যে বাড়িতে তিনি এখন আছেন, সে বাড়িখানা শহরের কোলাহল থেকে বহু দূরে। চারিদিকে বেশ একটা শান্ত নির্জন পরিবেশ। ফল ও ফুলের বাগান রয়েছে সেখানে। সেই সব গাছ-গাছড়া তিনি নিজে রোজ একবার ক'রে দেখেন। মালীকে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কচি কচি ফুলগাছের পরিচর্যা করান। একবার ঝড়ে সেই সব গাছ-গাছড়া প'ড়ে যায়। তা দেখে তাঁর যে দুঃখ হয়েছিল, সে নিতান্ত আন্তরিক। নইলে তিনি বলতেন না—"দেখছ তো আজ বাগানের চেহারা। সেই ঝড়ে আমার কী ক্ষতিই না ক'রে গেছে। কচি কচি ফুলগাছ মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেল, সমস্ত ফুল গেল বাতাসে উড়ে। এ ক'দিন ধ'রে মালীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে প'ড়ে-যাওয়া গাছগুলোকে উঠিয়ে সোজা ক'রে রাখবার ব্যবস্থা করছি।"

কথা বলবার সময় সেদিন স্পষ্ট লক্ষ্য করেছিলাম গাছের জন্যে তাঁর কী গভীর দরদ ও মমতা। তাদের দুর্দশায় তিনি যেন আপন জনের মতই দুঃখিত।

ছোট-ছেলেমেয়েদের বড় ভালোবাসেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর কাছে তাদের অবাধ গতি। কচি কচি ছেলেমেয়েরা যখন ঘিরে দাঁড়ায় তাঁকে, তখন তাঁর সে কি আনন্দ। নিজের বয়েস ভুলে গিয়ে ছোট্ট শিশুটি হ'য়ে যান—তাদের সঙ্গে খেলা করেন, গল্প করেন।

একদিন সকালে আমরা গিয়ে হাজির। দেখি, তিনি দোতলার বারান্দায় ব'সে। হাতের কাছে রঙ, তুলি, আর কোলের ওপর একটা ছোট ফুটবল। তিনি সেটাতে লাল নীল রঙ লাগাচ্ছেন।

—"একি, হঠাৎ ফুটবল রঙাচ্ছেন!"

প্রশ্ন শুনে অবনীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন—"হাঁ রঙাচ্ছি, না রঙিয়ে

কি উপায় আছে? দিদিমণির ফরমাস। তাঁর হুকুম কি তামিল না ক'রে পারি। রঙচঙে না হ'লে মনে ধরবে না যে।"

দিদিমণি হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথের নাতনী মায়া দেবী। যখনকার কথা বলছি তখন তার বয়েস দু'বছর কি আড়াই বছর।

কলকাতা থেকে একবার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে গেল তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁকে প্রণাম জানাতে—গুপ্ত-নিবাসে। ছেলেমেয়েরা সবাই ঘিরে বসল। তিনি গল্প বল্‌তে লাগলেন তাদের ফরমাস মতো। গল্প বলেন কী সুন্দর ক'রে। কিশোর শ্রোতারা বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে শুনে যায়। মাঝে মাঝে কেউ কেউ অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নও ক'রে বসে। তিনি তারও জবাব দিয়ে যান। ক্লান্তি নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে ব'সে ছেলেদের গল্প শোনান মজার মজার।

তাঁর হয়তো ব'সে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, এই ভেবে আমরা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। তিনি বলেন—"আমার কষ্ট কোথায়! এই এরা সব এসেছে আমার কাছে, আমাকে ঘিরে বসেছে,—কষ্ট তো সব দূরে পালিয়েছে আজ। তোমরা জানো না, এরাই আমাকে শান্তি দেয়, আমার সকল কষ্ট দূর করে।"

অটোগ্রাফের খাতা খুলে দাঁড়ায় ছেলেমেয়েরা। সে কি একটা দুটো! তিনি কিন্তু হাসিমুখে সই ক'রে যান একটার পর একটা।

একটি ছেলে বায়না ধরল—"আমাকে, ছবি এঁকে দিতে হবে।"

তিনি বললেন—"বেশ, নিয়ে এসো খাতা।" ছেলেটি খাতা এগিয়ে দেয়। তিনি তাতে একটি লোকের মুখ এঁকে দেন। লোকটি সন্দেশ খাচ্ছে। তার তলায় সই করেন নিজের নাম। বলেন—"দেখছ, অবনীন্দ্রনাথ সন্দেশ খাচ্ছেন!"

আমরা সবাই হেসে উঠি। ছেলেটি তো মহাখুশি।

মানুষের মত মানুষ দেশে জন্মগ্রহণ করে খুব কম। কিন্তু সেই রকম মানুষ যখন আমাদের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই তখন আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁর সংস্পর্শে এসে নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করি।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁচেছেন। আমাদের তিনি দিয়েছেন অনেক, বহুমূল্য জিনিস দিয়েছেন স্বদেশের শিল্পভাণ্ডারে।

তাঁর দেওয়া অমূল্য সেই মণিময় দিয়ে গড়া বর্তমান ভারতের শিল্প-সৌধ। সকল কোলাহলের বাইরে থেকে নিঃশব্দে, নীরবে তিনি শুধু দানই ক'রে গেছেন, বিনিময়ে চাননি কিছুই কোনদিন। কিন্তু আমাদের পালা এসেছে এবার। আজ কী দিয়ে আমরা তাঁর ঋণ পরিশোধ করব? সে ঋণ পরিশোধ করা কি সম্ভব!—সে যে বিরাট, অনন্ত। আমরা তাঁকে দেব শুধু অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রার্থনা করব ভগবানের কাছে তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি, তাঁর দীর্ঘায়ু। তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি।—

রূপের পূজারী, হে গোপনচারী
স্বপন-পশারী,—তোমার দানে
হে আপনভোলা, দিলে বুকে দোলা
কত রূপ রসে ছন্দে গানে।

একদা নবীন কিরণে রবির
লভিলে জীবনে যে বাণী গভীর
আজো তারি সুর বাজে সুমধুর
হে রাখাল, তব বেণুর তানে॥

ভোরের পাখির কাকলী লোভন
লেখনে তোমার ধরিল কায়া,
সন্ধ্যা-উষার স্বপন শোভন
তুলিতে বুলালো মোহন মায়া।

লেখায় রেখায় তুমি কবি,—তব
তুলিতে বুলিতে ছবি নব নব!
পূজাদীপে ধূপে, রঙে রসে রূপে
অরূপের দেখা পেলে কি প্রাণে॥

বাংলার মেয়ে—অবলা কমলা—
হৃদয়ে তোমারে ধরিতে চায়,
বাংলার মেয়ে—শিউলি কোমল—
চরণে লুটায়ে পড়িতে চায়।

ওগো অনুরাগী, তোমারে যতনে
নিভৃতে বসায়ে প্রেমের আসনে,
নাহি জানে, হায়, কী দিবে তোমায়
তারা শুধু ভালোবাসিতে জানে ॥

চির-শিশুদের পুতুল-খেলায়
হে প্রিয়বন্ধু, খেলার সাথী,—
চির-কিশোরের মিলন-মেলায়
পরমানন্দে রয়েছো মাতি।

তুষিলে সবারে আদরে সোহাগে,
ভূষিলে প্রাণের রঙে অনুরাগে।
শিশু ও কিশোরে বাঁধি প্রেমডোরে
চিরসুন্দরে ধরিলে ধ্যানে ॥

শেষ